সমগ্র গল্প

আলব্যের কাম্যু

সম্পাদনা : পলাশ ভদ্র

অ্যালব্যের কামু জন্মেছেন ১৯১৩ খ্রিঃ আলজিরিয়ায়। বেশিদিন বাঁচেননি, এক মোটর দুর্ঘটনায় ১৯৬০ খ্রিঃ মারা যান। এই স্বল্প সময়ে বেশি লিখে যেতে পারেননি। যা লিখে রেখে গেছেন তাঁর প্রতিটি রচনা সাহিত্য পাঠক-সমাজ গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিশেবে মান্যতা দিয়েছে।

দি আউটসাইডার (*The Outsider*) প্লেগ (*The Plague*) এবং দ্য ফল (*The Fall*) এই তিনটি আধুনিক উপন্যাস তাঁকে খ্যাতির তুঙ্গে তুলে দেয়। ১৯৫৭ খ্রিঃ পান নোবেল পুরস্কার। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক ক্যালিগুলা (*Caligula*) মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং (*Misunderstanding*) প্রভৃতি। দুটি দর্শনের বই 'দ্য মিথ অব সিসিফাস' (*The Myth of Sisiphus*) ও দ্য রেবেল (*The Rebel*)।

একথা সত্য ঐসব রচনা এতই গুরুত্ব পেয়ে যায়, গল্পকার কামু অবহেলিত হয়ে পড়েন। বেশি গল্প লিখে যেতে পারেন নি, মাত্র ছটি গল্পের ভিতর দিয়ে গল্পকার কামুর উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

১৯৫৭ খ্রিঃ পারীর গালিমার থেকে *L'Exile et le royauine* (*Exile and the kingdom*) নামে বেরয় ছটি গল্পের সংকলন। ফুটে ওঠে চমৎকাররূপে মানবসত্তার স্বাধীনতার সংঘাতগুলো। বস্তুজগৎ, হৃদয়বৃত্তি, অস্তিত্বের সঙ্কট, এলিয়েনেশন, স্বাধীনভাবে পছন্দের অসম্ভবতা, আশা নিরাশার দোলাচল, একা এবং একক হয়ে ওঠার তীব্র লড়াই, যন্ত্রণা, ধর্ম ও অবিশ্বাস এই ছয়টি গল্পে ফুটে ওঠে। অন্য রচনা অপেক্ষা এ রচনাগুলোর গুরুত্ব এতটুকু কম নয়। সংকলনের সবকটি গল্প অনূদিত হয়েছে মূল ফরাসী থেকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সমগ্র গল্প

ফরাসী থেকে অনুবাদ

আলব্যের কামু

সম্পাদনা

পলাশ ভদ্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এবং মুশায়েরা

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

SAMAGRA GALPA
Bengali Translation of Complete short stories of Albert Camus
Edited by Palas Bhadra

Rs. 125.00

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪১৭। এপ্রিল ২০১০

প্রকাশক
সঞ্জয় সামন্ত
এবং মুশায়েরা
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ
অভিজিৎ পাল

মুদ্রক
প্রিন্টিং আর্ট
৩২ এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : একশত পঁচিশ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রাক্‌কথন

কাম্যু'র গল্পগ্রন্থ 'নির্বাসন ও রাজ্য' (L'Exil et le royaume) গালিমার প্রকাশ করে ১৯৫৭য়। একই বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান কাম্যু। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৪ বছর। কিপলিং-এর পরেই সর্বকনিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর নোবেল জয়। গ্রন্থটিতে মোট ছটি গল্প রয়েছে। ১৯৫৫-এর গ্রীষ্মে ইতালিতে থাকার সময়ে কাম্যু গল্পগুলি লেখেন। সমসময়েই তিনি রচনা করেন অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'পতন' (La Chute)। অনেক বড় হয়ে যাওয়ায় 'পতন' আলাদাভাবে ১৯৫৬-তে প্রকাশিত হয়। 'নির্বাসন ও রাজ্য' সংকলনটির নামের মধ্যেই এক সুগভীর ব্যঞ্জনা রয়েছে। সমালোচকের ব্যাখ্যায় 'নির্বাসন' হল ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং একই সঙ্গে নৈতিক। অন্যদিকে 'রাজ্য' হল হারানো স্বর্গ।

প্রথম গল্প 'ব্যভিচারিণী' (La Femme adultére) এক চমৎকার বুনোটে নির্মিত। এখানে মানসিক অস্তিত্ব এবং বস্তুবাদী দুনিয়ার এক আবেগজাত সংযোগের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। নাম শুনে বিভ্রান্তি আসলেও এ কোন শারীরিক ব্যভিচারের কাহিনী নয়। কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র জানিন (Janine) রাতের মরুভূমিতে পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত হবার এবং এক আত্মিক মুক্তির তীব্র অনুভবে ভেসে যায়। এটির রচনাকাল ১৯৫৪-র নভেম্বর।

বন্ধু জাঁ গ্রেনিয়ের গল্পটি পছন্দ করতেন। তাঁর মতামত খুবই গুরুত্ব পেত কাম্যুর কাছে। গ্রেনিয়ের খুবই পছন্দ করতেন বোবারা (Les Muets) এবং অভ্যাগত (L'Hôte) গল্প দুটি। ছটি গল্পের মধ্যে 'জোনাস' (Jonas ou l'artiste au travail) গল্পটি শুধুমাত্র পারি-র পটভূমিতে নির্মিত। বাকীগুলির প্রেক্ষিত তৃতীয় দুনিয়া। 'উদ্ভিন্ন প্রস্তর' (La Pierre qui Pousse) ব্রাজিলের ওপর লেখা। বিশ্বাসঘাতক (Le Rénégat) ঠিক স্পষ্ট না হলেও মনে করা হয় আফ্রিকার কোন দেশ সম্ভবতঃ আলজিরিয়া। বাকীগুলির পটভূমি অবশ্যই কাম্যুর জন্মস্থান আলজিরিয়া। আলজিরিয়া নিয়ে কাম্যুর আজন্মের দ্বিধার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় গল্পগুলির আন্তরিক পাঠে। সংকলনের দ্বিতীয় গল্প 'বিশ্বাসঘাতক' এক চূড়ান্ত অশুভ দুনিয়ার ইঙ্গিত বয়ে আনে। এক মিশনারির চরম অত্যাচার ও ঘৃণার সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুবরণ করাকে কেন্দ্র করে আখ্যানটি নির্মিত।

পরের গল্প 'বোবারা' (Les Muets) কাম্যু বাল্যস্মৃতি-তাড়িত হয়ে এক শ্রমজীবী ধর্মঘট অবলম্বনে লেখেন। পারিতে যখনই কাম্যুকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তখনই গল্পটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কাম্যু বলেছেন যে নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলি 'আমারই পরিবারের সদস্য'। বিচ্ছিন্নতা আর আশা একই সাথে গল্পটিকে মহিমান্বিত করেছে।

'অভ্যাগত' (L'Hôte) আলজিরিয়া অভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত। এখানে শিক্ষক — যেন কাম্যুরই একটি মুখ। তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব যেন লেখকেরই আলজিরিয়া পরিস্থিতির কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থানের চিত্রাঙ্কন করে। এ কাহিনী একাধারে রাজনৈতিক ভাষ্য এবং অস্তিত্ববাদী আখ্যান।

'জোনাস' এক পারিবাসী প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু জনপ্রিয়তাই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত সংকটের ফলে সে বিভ্রান্ত। ধীরে ধীরে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে রুদ্ধ ঘরে সে ছবি এঁকে যায়। শেষে তাকে নিজের ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। এক নতুন ক্যানভাসে সে অস্পষ্ট অক্ষরে লিখেছে Solidaire (সহযোগী) অথবা Solitaire (একাকী)।

'উদ্ভিন্ন প্রস্তর' গল্পে ফরাসি যন্ত্রবিদ দারাস-এর সাথে এক কৃষ্ণাঙ্গ রাঁধুনির সম্পর্কের বিন্যাস রয়েছে। খৃষ্টিয় এবং পাগান বিশ্বাসের এক ঐক্য এখানে লক্ষিত হয়।

অন্যান্য মহৎ স্রষ্টাদের মতই কাম্যুর ছোটগল্পেরও এক অনবদ্য সমকালীনতা রয়েছে। নিজস্ব বোধ ও বিচার অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা করার অধিকার প্রত্যেক পাঠকের রয়েছে।

এপ্রিল ২০১০ পলাশ ভদ্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচিপত্র

ব্যভিচারিণী ৯
বিশ্বাসঘাতক অথবা এক বিভ্রান্ত মন ২৩
বোবারা ৩৭
অভ্যাগত ৪৮
কর্মব্যস্ত শিল্পী ৬০
উদ্ভিন্ন প্রস্তর ৮৫

ফরাসী থেকে ভাষান্তর

অরূপ মন্ডল, অজয় বসু, চিন্ময় গুহ, পলাশ ভদ্র, পার্থ গুহবক্সী, পবিত্র সেনগুপ্ত ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ব্যভিচারিণী

জানলা বন্ধ, তবু কোথা থেকে কে জানে একটা রোগাভোগা মাছি কিছুক্ষণ থেকেই বাসের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখানে মাছি বেশ বিরল, এটি নিঃশব্দে ক্লান্ত পাখায় ভর করে এ'দিক থেকে ও'দিক করছে। জানিন কিছু সময়ের জন্য আর সেটিকে দেখতে পেল না, তারপর আবার তার স্বামীর নিশ্চল হাতের ওপর এসে বসতে দেখল। বেশ ঠাণ্ডা জানলায় আঁচড় কাটা বালি ভরা বাতাসের প্রতিটা ঝাপটের সাথে সাথে মাছিটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। শীতের সকালের নিষ্প্রভ আলোয় লোহা-লক্কড়ের ভয়ানক শব্দ তুলে বাসটি দোল খেয়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে, প্রায় এগোচ্ছে না বললে চলে। জানিন স্বামীর দিকে চেয়ে দেখল। ছোট কপালের ওপর ঝুলে পড়া গুচ্ছ গুচ্ছ কাঁচাপাকা চুল, চওড়া নাক, স্ফীত ঠোঁট, যেন এক অভিমানী যক্ষ। রাস্তার প্রতিটা গর্তে সে জানিনের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে। তারপর ছড়ানো পা দুটির ওপর তার ভারী শরীর আবার ঢলে পড়ছে, শূন্য দৃষ্টি, ফের নিশ্চল, অন্যমনস্ক। প্রাণের সাড় ছিল একমাত্র তার স্থূল রোমহীন হাত দু'টিতে ধূসর ফ্লানেলের অন্তর্বাস জামার হাত ছাড়িয়ে কব্জি ঢেকে নামাতে সে দু'টিকে আরো খাটো দেখাচ্ছে। হাত দু'টি একটা ছোট ক্যাম্বিসের সুটকেসকে দুই হাঁটুর ফাঁকে এমন শক্ত করে ধরেছে যে মাছিটির ইতস্তত গতিবিধি যেন তারা টেরই পাচ্ছে না।

হঠাৎ বাতাসের আস্ফালন আরো পরিষ্কার শোনা গেল, বাসকে ঘিরে থাকা বালিমাখা কুয়াশা হল আরো ঘনীভূত। শার্সির ওপর মুঠো মুঠো বালি আছড়ে আছড়ে পড়ছে যেন কোনো অদৃশ্য হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। মাছিটা ঠাণ্ডায় জমা একটা পাখা একবার ঝেড়ে নিল, তারপর পাগুলো নেড়েচেড়ে নিয়ে লাগাল উড়ান। বাসটার গতি গেল কমে, প্রায় থেমে থেমে যায় আর কি। তারপর আবার বাতাস কিছুটা শান্ত হয়েছে মনে হল, কুয়াশাও কিছুটা পরিষ্কার হল, বাস আবার চলল আগের গতিতে। ধুলোয় ঢাকা দৃশ্যপটে কোথাও কোথাও ফাঁকফোকর দিয়ে আলো আসতে লাগল। যেন কোনো ধাতুর পাত থেকে কেটে বার করা দু'তিনটে শীর্ণ, ফেকাসে খেজুর গাছ জানালার সামনে ছিটকে এসেই এক লহমায় হারিয়ে যাচ্ছে।

—কী একখানা দেশ। বলল মার্সেল।

বাসভর্তি আরবেরা বার্ণুসে আগাপাশতলা ঢেকে ঘুমোনোর ভান করছে। কেউ কেউ আসনের ওপর পা তুলে দিয়েছে আর বাসের দুলুনির সাথে সাথে দুলছে অন্যদের থেকেও বেশি। তাদের নৈঃশব্দ ও ভাবলেশহীনতা জানিনের ওপর চেপে বসতে থাকে; ওর মনে হতে থাকে যেন এই মূক সঙ্গীদের সাথে সেই কবে থেকে

BanglaBook.org

(La Femme adultére)

যাত্রা করেছে। অথচ বাসটা ছেড়েছে রেলস্টেশন থেকে ভোরবেলায়, তারপর এই শীতের সকালে দু'ঘণ্টা ধরে এগিয়ে চলেছে প্রস্তরাকীর্ণ জনমানবহীন মালভূমি ধরে যা, অন্ততপক্ষে শুরুতে, একেবারে সোজাসুজি রক্তিম দিগন্তে গিয়ে মিশেছিল। কিন্তু তারপর বাতাস উঠতে থাকে আর ধীরে ধীরে এই বিশাল বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে গ্রাস করে। তখন থেকেই যাত্রীরা আর কিছুই দেখেনি; এক এক করে সকলেই চুপ করে গেছে, নিঃশব্দে যেন এক নিদ্রাহীন রাত্রিতে এগিয়ে চলেছে সবাই, শুধু গাড়িতে ঢুকে আসা বালিতে উত্তপ্ত ঠোঁট ও চোখ মুছে নিয়েছে কখনো সখনো।

"জানিন!" স্বামীর ডাকে চমকে উঠল সে। আবার মনে হল যে তার মত লম্বা দশাসই মহিলার পক্ষে এই নামটা কী হাস্যকর। মার্সেল জানতে চায় তার নমুনার বাক্সটা কোথায়। আসনের নিচের ফাঁকা জায়গাটায় পা চালিয়ে দেখে জানিন। কিছু একটা পায়ে ঠেকে, ওটাই নিশ্চয় বাক্সটা—ধরে নেয় সে। আসলে একটু হাঁফ না খেয়ে সে নিচু হতে পারে না। অথচ স্কুলে জিমন্যাস্টিক্সে সে প্রথম হয়েছিল, জানতই না হাঁফ ধরা কাকে বলে। এতদিন হয়ে গেল কি? পঁচিশ বছর তো কিছুই না। মনে হয় যেন মাত্র কালকেই স্বাধীন জীবন আর বিয়ের মধ্যে সে দোটানায় পড়েছিল, কালকেই যেন হয়তো একা একা বার্ধক্যের দিনগুলো কাটানোর কথা ভেবে সে চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছিল। সে আর একা নয়, যে আইনের ছাত্রটি সবসময় তার সাথে সাথে থাকতে চেয়েছিল এখন তার পাশে। যদিও সে একটু বেঁটেই আর তার ব্যগ্র তীক্ষ্ণ হাসি, তার ঠিকরে বেরোনো কালো চোখ কোনোটিই তার তেমন পছন্দ নয়, তবু শেষ পর্যন্ত তাকে জামিন গ্রহণ করেছিল। এই দেশের অন্যান্য ফরাসীদের মতই জীবনের সাথে মুখোমুখি টক্কর দেওয়ার যে সাহস তার আছে তা কিন্তু জানিনের খুবই ভালো লাগে। কোনো ঘটনা বা মানুষ আশানুরূপ না হলে তার মুখের যে বিমর্ষ চেহারা হয় তাও তার বড়োই পছন্দের। বিশেষ করে ভালোবাসা পেতে সে ভালবাসে, আর মার্সেল তার ওপর যত্ন পরিচর্যা ঢেলে দিয়েছে। জানিন যে তার কাছে রীতিমত বিদ্যমান সে কথা তার কাছে বারম্বার জানান দেওয়াতেই জানিনের অস্তিত্ব বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। না, সে একা নয়...

জোরে জোরে হর্ণ দিতে দিতে বাসটা অদৃশ্য বাধা সরিয়ে পথ করে নিচ্ছে। গাড়ির মধ্যে অবশ্য কেউই নড়াচড়া করছে না। জানিনের হঠাৎই মনে হল যেন কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে, ঘুরে উল্টো দিকের আসনের দিকে তাকাল সে। লোকটি আরব নয়, শুরুতেই যে তাকে খেয়াল করেনি সে কথা ভেবে জানিন অবাকই হল। তার পরণে সাহারার ফরাসী বাহিনীর উর্দি, তার রোদে পোড়া, শেয়ালের মত সরু লম্বা মুখের ওপর ঝুলে আছে একটা খাকি কাপড়ের টুপি। কটা চোখে কেমন একরকম বিরক্তি নিয়ে সে স্থির দৃষ্টিতে জানিনের দিকে তাকিয়ে আছে। আচমকাই রাঙা হয়ে জানিন আবার তার স্বামীর দিকে ফিরল, মার্সেল তখনো সামনের কুয়াশা আর বাতাসের দিকে তাকিয়ে বসে। জানিন কোটটা ভালো করে জড়িয়ে বসে। কিন্তু সে তখনো ফরাসী সৈনিকটিকে দেখতে পাচ্ছে, লম্বা আর রোগা, মাপমতো উর্দিতে

BanglaBook.org

এতটাই রোগা যেন সে কোনো শুকনো সহজচূর্ণিত বস্তুতে, বালি আর হাড়ের মিশ্রণ দিয়ে বানানো। ঠিক তখনই সামনের আরবদের রোগা রোগা হাত আর তামাটে মুখ জানিনের নজরে পড়ল, তাদের প্রচুর কাপড়চোপড় সত্ত্বেও জায়গা যেন কোনো অভাব নেই, যদিও একই রকম আসনে সে আর তার স্বামী কোনোমতে বসে আছে। হাঁটুর দিকে কোটটা টেনেটুনে নিল জানিন। তবুও ও তো মোটা নয়—বরং লম্বা ও দশাসই বলা যায়, গোলগাল এবং পুরুষদের দৃষ্টি থেকে সে বেশ বুঝতে পারে যে কিছুটা শিশুর মতো মুখ আর উজ্জ্বল অকপট চোখের পাশাপাশি তার লম্বা, উষ্ণ ও লোভনীয় শরীর নিয়ে সে এখনো বেশ আকর্ষক না, সে যা ভেবেছিল তা কিছুই হয়নি। যখন মার্সেল তাকে সঙ্গে আসতে বলে তখন সে প্রতিবাদ করেছিল। এদিকে আসার কথা মার্সেল ভাবছে অনেকদিন—যুদ্ধর পরে যখন আবার ব্যবসাপত্র স্বাভাবিক হচ্ছে তখন থেকেই। আইন পড়া ছেড়ে বাবা-মার কাছে থেকে যে ছোট কাপড়ের ব্যবসা সে ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল, যুদ্ধের আগে তার থেকে তাদের ভালোভাবেই চলে যেত। সাগরবেলায় যৌবনের দিনগুলি খুবই আনন্দের হতে পারে। কিন্তু শারীরিক শ্রম তার তেমন পোষায় না, কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রীকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাওয়া ছেড়ে দিল সে। তাদের ছোট্ট গাড়িটা তাদের শহরের বাইরে নিয়ে যেত কেবলমাত্র রবিবার বিকালে হাওয়া খেতে। বাকি সময়টা সে এই আধা ইউরোপীয় মহল্লার আচ্ছাদিত পথে দাঁড়ানো তার নানা রঙের কাপড়ে ঠাসা দোকানে বসেই কাটিয়ে দিতে পছন্দ করত। ঠিক দোকানের ওপরেই আরবি পরদা আর আসবাবে সাজানো তিনটি ঘরে তাদের সংসার। ছেলেপুলে হয়নি তাদের। আধবন্ধ জানলার পেছনে আধো অন্ধকারের মধ্যেই বছরগুলো কেটে গেছে। গ্রীষ্মকাল, সমুদ্রবেলা, প্রমোদভ্রমণ, এমনকি খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা—সবই এখন অতীত। ব্যবসা ছাড়া আর কোনো কিছুই মার্সেলকে টানে না। জানিনের মনে হয় যে মার্সেলের আসল উৎসাহ কিসে তা সে জানতে পেরেছে—টাকা আর, কেন কে জানে, এ তার ভালো লাগে না। অথচ তার তো ভালোই হচ্ছে। মার্সেল কৃপণ তো নয়ই বরং, উদার, বিশেষ করে তার সঙ্গে তো বটেই। "আমার কিছু হলেও" সে প্রায়ই বলত, "তোমার জন্য ব্যবস্থা করা থাকবে।" আর অবশ্যই প্রয়োজনের জন্য ব্যবস্থা করতেই হয়। কিন্তু প্রাথমিক প্রয়োজন বাদে আর যা কিছু—তার জন্য কী ব্যবস্থা? মাঝে মাঝেই ভাসা-ভাসা ভাবে এই কথাটাই জানিনের মনে আসে। তার মধ্যে মার্সেলের হিসেবনিকেশে সে সাহায্য করে, কখনো সখনো ওর হয়ে দোকানও দেখে। গ্রীষ্মকালটাই বড়ো কষ্টের, গরমে একঘেয়েমির মধুর অনুভূতিটুকুরও গলা বুজে আসে।

হঠাৎই ভরা গ্রীষ্মেই যুদ্ধ এল, সেনাবাহিনীর ডাক পেল মার্সেল, তারপর অসুস্থতার কারণে ছাড়পত্র পেল, তারপর কাপড়ের আকাল, ব্যবসা মন্দ, রাস্তা সব নির্জন, গরম আগুন। এখন যদি কিছু হয় তবে আর জানিনের জন্য কিছুই থাকবে না। সেই জন্যই, বাজারে আবার কাপড় আসার সঙ্গে সঙ্গেই, মার্সেল দালাল বাদ দিয়ে নিজেই উচ্চ মালভূমি ও দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সরাসরি আরব দোকানদারদের

BanglaBook.org

কাছে কাপড় বেচার কথা ভেবেছিল। জানিনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। জানিন জানত যে এখানে যাতায়াত কত কষ্টের, তাছাড়া ওর শ্বাসকষ্ট হয়। তাই ঘরে থাকতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু মার্সেল ছিল নাছোড়বান্দা। জানিন রাজি হয়ে যায়, না করতেও যে অনেক শক্তির দরকার। তাই এখন এই বাসযাত্রা, আর সত্যিই ও যা ভেবেছিল তেমন কিছুই হয়নি। ওর ভয় ছিল গরমের, মাছির ঝাঁকের, মৌরীর গন্ধে ভরা নোংরা হোটেলের। এমন ঠাণ্ডা, এমন হিমকামড় বাতাস, এই গ্রাবরেখা ছাওয়া মেরুসম মালভূমির কথা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। সে বরং স্বপ্ন দেখেছিল খেজুর গাছ আর নরম বালির। এখন দেখে যে মরুভূমি তেমন নয় মোটেই, এখানে কেবলই পাথর, সর্বত্র পাথর, যেমন আকাশে শুধুই কর্কশ ঠাণ্ডা পাথরের ধুলো, তেমনই মাটিতে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো ঘাস ছাড়া নেই আর কিছুই!

বাসটা আচমকা দাঁড়ায়। যে ভাষাটা জানিন এক ফোঁটাও না বুঝে সারা জীবন শুনে এসেছে তাতেই চালক চেঁচিয়ে কিছু বলল। "কী হল কী?" মার্সেল প্রশ্ন করে। চালক এবার ফরাসীতে জানায় যে কারবুরেটারে নির্ঘাত বালি জমেছে, মার্সেল আবার দেশটাকে শাপশাপান্ত করে। চালক দন্ত বিকশিত করে হাসে, আশ্বাস দেয় যে এমন কিছু হয়নি, কারবুরেটার পরিষ্কার করে নিলেই আবার চলবে বাস। সে দরজা খুলতেই সকলের মুখে বালির হাজারো দানার ঝাপটা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এল বাসের মধ্যে। আরবরা সবাই নিঃশব্দে বার্ণুসে নাক গুঁজে ঢেকেঢুকে বসল। "দরজা বন্ধ কর", মার্সেল চেঁচায়। চালক হাসতে হাসতে দরজার কাছে ফিরে আসে। ধীরেসুস্থে, ড্যাশবোর্ডের নিচ থেকে কয়েকটি যন্ত্রপাতি তুলে নিয়ে, দরজা খোলা রেখেই সে আবার ঘন কুয়াশায় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মার্সেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "নিশ্চিত থাকতে পার যে বেটা জিন্দিগিতে মোটরগাড়ি দেখেনি।" "যাক না।" বলে জানিন। হঠাৎই সে চমকে ওঠে। গাড়ির একদম কাছে, রাস্তার ওপর জোব্বায় ঢাকা কয়েকটি নিশ্চল মূর্তি। মাথার গুণ্ঠনের নিচে আর মুখের ওপর টানা কাপড়ের বেড়াজালের পেছনে কেবল তাদের চোখটুকুই দৃশ্যমান। নির্বাক, যেন ভুঁই ফুঁড়ে বেরিয়ে যাত্রীদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তারা। "মেষপালক" মার্সেল জানায়।

বাসের মধ্যে সব চুপ। যাত্রীরা সকলে মাথা নিচু করে যেন অন্তহীন মালভূমির ওপর ছুটে চলা উদ্দাম হাওয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে ব্যস্ত। জানিনের হঠাৎ খেয়াল হল যে বাসের মধ্যে মালপত্র নেই বললেই চলে। রেল স্টেশনে চালক তাদের তোরঙ্গটা আর গাঁটরিটা ছাদের ওপর তুলে দিয়েছিল। বাসের ভেতরের মাল রাখার তাকগুলোতে বাঁকা লাঠি আর টুকরি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। এই দক্ষিণীরা মনে হচ্ছে খালি হাতেই যাত্রা করেছে।

চালক ফিরে এল, তার হাবভাব তেমনই চটপটে। মুখের ওপর সেও জড়িয়ে নিয়েছে কাপড়, তার ওপরে চোখ দু'টি হাস্যময়। সে ঘোষণা করে যে এক্ষুণি রওনা দেওয়া হবে। দরজা বন্ধ করে দেয় সে, বাতাসের শব্দ যায় বন্ধ হয়ে, জানালার ওপর

BanglaBook.org

বালি বর্ষণ আরো পরিষ্কার কানে আসে। বাসের ইঞ্জিন কয়েকবার কেঁপে চুপ করে যায়। স্টার্টারের অনেক অনুনয়ের পর অবশেষে চাঙ্গা হয় সে, অ্যাক্সিলেটরের প্রবল তাড়নায় চিৎকার করে। জোরে হিক্কা তুলে বাস চলতে থাকে। পেছনের শতছিন্ন পোশাক মেষপালকদের এখনো নিশ্চল দলটির থেকে একটি হাত শূন্যে ওঠে, তারপর কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। বাসটা প্রচণ্ড লাফাতে শুরু করে, রাস্তার অবস্থা আরো খারাপ। ঝাঁকুনিতে আরবেরা অবিরাম দুলে চলে। এত সত্ত্বেও জানিনের ভীষণ ঘুম আসছিল, হঠাৎই সামনে একটা লজেন্স ভরতি হলুদ বাক্স উপস্থিত। শেয়ালমুখো সৈনিকটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। একটু ইতস্তত করে সে একটি তুলে ধন্যবাদ জানায়। শেয়ালটি বাক্স পকেটস্থ করে তৎক্ষণাৎ হাসি গিলে ফেলে। সোজা তাকিয়ে থাকে সামনে, রাস্তার দিকে। জানিন ঘুরে মার্সেলের দিকে তাকায়, কেবলমাত্র শক্তপোক্ত ঘাড়টাই চোখে পড়ে। জানলা দিয়ে বাইরের ভাঙাচোরা রাস্তা ফুঁড়ে ওঠা ঘন কুয়াশার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে।

এতক্ষণের যাত্রার ক্লান্তি বাসের ভেতর জীবনের আভাসটুকুও যেন নির্বাপিত করে দিয়েছে, হঠাৎই বাইরে জোর শোরগোল শোনা গেল। বার্ণুস পড়া শিশুর দল লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে, লাফাতে লাফাতে, হাততালি দিতে দিতে বাসের দু'পাশে ছুটে বেড়াচ্ছে। দু'ধারে খাটো খাটো বাড়ির সারি। এক লম্বা রাস্তা ধরে বাস এগিয়ে চলেছে, ঢুকছে মরুদ্যানে। বাতাস এখনো বইছে, কিন্তু দেওয়ালে আটকে পড়ে যাওয়ায় বালির দানা আর আলোকে গ্রাস করছে না। তবুও আকাশ এখনো মেঘে ঢাকা। চিৎকার চেঁচামেচি আর ব্রেকের ভীষণ শব্দের মধ্যে বাস এসে থামল নোংরা জানলাওলা একটি হোটেলের খিলানের সামনে। নিচে নামতেই জানিনের মনে হল যেন সবকিছু টলমল টলমল করছে। বাড়িগুলোরা ওপরে একটা সুর হলুদ রঙের মিনার চোখে পড়ছে। বাঁদিকে মরুদ্যানের প্রথম খেজুর গাছের সারি, সেদিকে যেতে জানিনের ভালোই লাগত। কিন্তু যদিও বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন, ঠাণ্ডা একেবারে ক্ষুরধার, বাতাসে কাঁপুনি লেগে যাচ্ছিল তার। মার্সেলের দিকে ঘুরতেই সেই সৈনিকটিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল জানিন। তার হাসি বা অভিবাদনের জন্য অপেক্ষাও করছিল সে, কিন্তু সৈনিকটি তার দিকে একেবারেই না তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে নজরের বাইরে চলে গেল। মার্সেল তখন বাসের ছাদের ওপর থেকে কালো রঙের বিশাল কাপড়ের তোরঙ্গটি নামাতে ব্যস্ত। বেশ কঠিন কাজ। মালপত্র দেখার লোক বলতে একমাত্র চালক, সে তো ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে চারিদিকের বার্ণুসের ব্যূহর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে চলেছে। চারিদিকের ঠিক যেন হাড় আর চামড়া থেকে কেটে বানানো অসংখ্য মুখের মাঝে দাঁড়িয়ে, কর্কশ চিৎকারে কোণঠাসা হয়ে, জানিন হঠাৎই উপলব্ধি করল সে কতটা ক্লান্ত। "আমি ঢুকলাম", মার্সেলকে বলল সে, সে তখন ওদিকে ধৈর্য্য হারিয়ে চালকের সঙ্গে চেঁচামেচি করছে।

জানিন হোটেলে ঢুকল। ম্যানেজার, এক রোগা স্বল্পবাক ফরাসী, তার দিকে এগিয়ে এল। নিয়ে গেল দোতলার রাস্তার দিকের বারান্দার ওপর একটি ঘরে, সেখানে শুধু

BanglaBook.org

একটা লোহার খাট, সাদা এনামেল করা একটা চেয়ার, একটা পরদা-ছাড়া ওয়ার্ডরোব, আর হোগলার পার্টিশনের পেছনে টয়লেট, সেখানে বেসিনের ওপর মিহি বালির প্রলেপ। ম্যানেজার দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল, জানিন নেড়া চুনকাম করা দেওয়ালের মধ্যে থেকে আসা ঠাণ্ডার কামড় টের পেল। ব্যাগটা কোথায় রাখবে, নিজেকেই বা কোথায়, ভেবে পায় না। হয় শুয়ে পড়তে হয়, নয়তো দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয়, দুই ক্ষেত্রেই ঠাণ্ডায় কাঁপা ছাড়া উপায় নেই। জানিন দাঁড়িয়েই থাকল, হাতে ব্যাগ, দৃষ্টি নিবদ্ধ ছাদের কাছে ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে উঁকি মারা আকাশের দিকে। সে অপেক্ষা করছে, কিসের জন্য তা নিজেই জানে না। চেতনা জুড়ে শুধু তার একাকীত্ব, কেটে বসা শীত, আর হৃদয়ের কাছটায় কী এক বিষণ্ণ ভার। ও আসলে স্বপ্নই দেখছে, রাস্তা থেকে আসা এত শব্দ, মার্সেলের চেঁচামেচি কিছুই যেন তার কানে ঢুকছে না, বরং অনেক বেশি পরিষ্কার খেজুর গাছের মধ্যের উথাল পাথাল বাতাসের সৃষ্টি যেন কোনো নদীর কুলকুল, ওর মনে হল যেন গাছগুলি এখন আরো আরো কাছে। বাতাসের বেগ আরো বেড়ে গেল, জলের শান্ত কুলকুল এখন যেন তরঙ্গের বিক্ষুব্ধ হিসহিস। দেওয়ালের ওধারে জানিন যেন মানসচক্ষে দেখতে পেল ঝোড়ো হাওয়ায় প্রসারমান ঋজু নমনীয় খেজুর গাছের এক বিস্তৃত সমুদ্র। ওর আশানুরূপ কিছুই হয়নি, তবু এই অদৃশ্য ঊর্মিমালা ওর ক্লান্ত চোখদুটিকে স্বস্তি দিল। ও দাঁড়িয়ে, গুরুভার, ঈষতানত, হাত দুটি ঝুলন্ত, স্থূল পা-দুটি বেয়ে উঠছে হিমেল স্রোত। ও স্বপ্ন দেখছে ঋজু নমনীয় খেজুর গাছের, স্বপ্ন দেখছে তরুণী দিনের।

পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়ে খাবার ঘরে গেল তারা। নেড়া দেওয়ালে আঁকা গোলাপি আর বেগুনি রঙের থকথকে পশ্চাতপটে ভাসমান উট ও খেজুর গাছ খিলান দেওয়া জানালা দিয়ে অল্পই আলো আসছে। মার্সেল হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে ব্যবসায়ীদের খবর দিচ্ছে। জামায় মিলিটারি তকমা আঁটা এক বৃদ্ধ আরব খাবার দিতে এল। অন্যমনস্কভাবে মার্সেল রুটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে। স্ত্রীকে সে জল খেতে দিল না। "ফোটানো নয়। বরঞ্চ মদ নাও।" জানিনের ভালো লাগে না, মদে ঘুম পায় তার। তাছাড়া মেনুতে শুয়োরের মাংস ছিল। "কোরানে শুয়োর খেতে মানা আছে। কিন্তু কোরান তো জানত না যে ভালভাবে রান্না করলে শুয়োরের মাংসে অসুখ হয় না। আমরা রান্না করতে জানি। কী ভাবছ?" জানিন কিছুই ভাবছে না, বা হয়তো নারীদের ওপর রাঁধুনীদের বিজয়ের কথাই ভাবছে সে। কিন্তু ওকে তাড়াতাড়ি করতে হল। পরের দিন সকালেই আরো দক্ষিণের দিকে রওয়ানা দিতে হবে, বিকেলের মধ্যেই এখানের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করে নেওয়া দরকার। মার্সেল বৃদ্ধ আরবটিকে জলদি কফি দিতে বলে। না হেসেই মাথা নাড়ে সে, তারপর টুকটুক করে বেরিয়ে যায়। "সকালে ধীরে ধীরে, বিকেলেও বেশি তাড়াতাড়ি নয়", হাসতে হাসতে বলে মার্সেল। তবুও শেষ পর্যন্ত কফি আসে। কোনমতে গলায় ঢেলেই ধুলো ভরা ঠাণ্ডা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে তারা। এ ব্যাপারে তার মতটা সে আবার জানিনকে জানিয়ে দেয়, অস্পষ্ট তত্ত্বটা হল এই যে এরা সবাই দামের চার ভাগের এক ভাগ

BanglaBook.org

পাওয়ার জন্য দ্বিগুণ দাম চায়। অস্বস্তির সঙ্গে দুই তোরঙ্গ বাহকের পেছনে পেছনে চলে জানিন। ভারি কোটের নিচে পশমের পোশাক পড়েছে, নয়তো আরো কম জায়গা নিতে পারলে খুশি হত সে। শুয়োরের মাংসটা ভালোই রান্না হয়েছিল, মদও সে খেয়েছিল অল্পই। তবু একটু অস্বস্তিই লাগছে।

ধূলিধুসর গাছে ভরা একটা ছোট্ট পার্কের মধ্যে দিয়ে চলছে তারা। পথে আরবরা বার্ণুস জড়াতে সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, যেন তাদের দেখতেই পাচ্ছে না। পরণে যাদের শতচ্ছিন্ন পোশাক তাদেরও চোখে মুখে যে অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তেমনটা জানিন তার শহরের আরবদের মধ্যে দেখেনি। তোরঙ্গের পেছনে পেছনে চলেছে জানিন, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যেন তার জন্যই পথ করতে করতে চলেছে সেটা। মেটে পাঁচিলের গায়ে একটা ফটক, সেটা পেরোতেই ওরা এসে পড়ল একটা ছোট চকে। সেখানেও তেমনই ধূলিধুসর গাছের সারি, আর উল্টো দিকের চওড়া জায়গাটায় খিলান আর দোকানের ভিড়। ওরা অবশ্য চকেই এসে থামল নীলচে রঙের কামানের গোলার মত দেখতে একটা বাড়ির সামনে, ভেতরে একটাই ঘর, সেটি কেবলমাত্র দরজার আলোতেই আলোকিত। একটা চকচকে কাঠের পাটাতনের ওপরে পাকা গোঁফওলা এক বৃদ্ধ আরব দাঁড়িয়ে। ছোট ছোট তিনটে নানারঙের গেলাসে পট থেকে চা ঢালছে সে। আধো অন্ধকারে আর কিছু ঠাওর করার আগেই মার্সেল আর জানিনের নাকে এসে ঠেকল পুদিনা চায়ের গন্ধ। চৌকাঠ ডিঙিয়ে সীসে ও টিনের মিশ্রণে বানানো চায়ের পট, পেয়ালা আর ট্রের মালা আর রঙিন পোস্টকার্ডের আবেষ্টন এড়াতে না এড়াতেই মার্সেল কাউন্টারের সামনে হাজির। জানিন দরজাতেই দাঁড়িয়ে রইল। আলো যাতে না আটকায় তাই সরে গেল এক পাশে। অন্ধকারের মধ্যে এতক্ষণে তার চোখে পড়ল বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর পেছনে, দোকানের ওই প্রান্তে ডাঁই করা অজস্র পেটমোটা বস্তার ওপর বসে তার দিকে চেয়ে হাসছে দুই আরব। লাল কালো গালিচা আর চিকন তোলা স্কার্ফ ঝুলছে দেওয়ালে, বস্তা আর সুগন্ধী বীজে ভরতি ছোট ছোট বাক্সে ঢাকা মেঝেটা কাউন্টারের ওপর একটা চকচকে পেতলের দাঁড়িপাল্লা আর দাগটাগ উঠে যাওয়া একটা পুরোনো গজকাঠি—তাদেরই চারিদিকে সার দিয়ে রাখা চিনির খণ্ড। মোটা নীল কাগজের মোড়ক থেকে বার করে একটি চিনির খণ্ডর ওপর থেকে কিছুটা কেটে নেওয়া হয়েছে। চায়ের সুগন্ধের পেছনেই পশম আর মশলার গন্ধ যখন বেশ পরিষ্কার, ঠিক তখনই বৃদ্ধ চায়ের পট নামিয়ে রেখে ওদের অভিবাদন জানাল।

মার্সেল ব্যবসার কথা বলে নিচু গলায়—এখনও সেইভাবেই খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিল। তোরঙ্গ খুলে কাপড় আর স্কার্ফগুলো দেখাল, দাঁড়িপাল্লা আর গজকাঠিটা ঠেলে সরিয়ে তার পসরা মেলে ধরতে লাগল বৃদ্ধের সামনে। উত্তেজিত হয়ে গলা চড়িয়ে কথা বলতে লাগল, বেমক্কা হাসতে থাকল মাঝে মাঝে—ঠিক যেন কোনো মহিলা যে মোহিত করতে চায় অথচ একেবারেই আত্মবিশ্বাসহীন। দু'পাশে হাত-ছড়িয়ে এবার বেচাকেনার অঙ্গভঙ্গি দেখাচ্ছে সে। বৃদ্ধ মাথা নেড়ে চায়ের ট্রেটি

BanglaBook.org

পেছনের দুই আরবের দিকে বাড়িয়ে দেয় কী যেন দু'তিনটি কথা বলে। দমে গিয়ে মার্সেল তার পসরা সব তুলে নিয়ে আবার ঢুকিয়ে ফেলে তোরঙ্গতে, কপাল থেকে অদৃশ্য স্বেদবিন্দু মুছে নেয়। ছোট কুলিটিকে ডাক দেয় সে, তারপর খিলানে ঢাকা দোকানের সারির দিকে এগিয়ে চলে তারা। প্রথম দোকানের মালিকটিও শুরুতে একইরকম অলিম্পিক ভাবভঙ্গি দেখায় তবু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এখানে তাদের কপাল একটু ভালো। "ওরা মনে করে ওরাই পরমেশ্বর", মার্সেল বলে, "কিন্তু ওরাও তো ব্যবসা করছে রে বাবা। সবারই তো এখন দিনকাল খারাপ।"

উত্তর না দিয়েই জানিন পেছন পেছন চলে। ঝোড়ো বাতাসটা এখন প্রায় বন্ধ। আকাশ একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। ঘন মেঘের মাঝের ফাঁকফোকর দিয়ে শীতল তীব্র আলো এসে পড়ছে। ওরা এখন চক ছেড়ে বেরিয়ে সরু সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। পাশের মেটে পাঁচিলের ওপর ঝুলছে ডিসেম্বর মাসের পচে যাওয়া গোলাপ, বা কোথাও কোথাও শুকনো পোকাধরা বেদানা। গোটা পাড়াটায় ধুলো আর কফি, কাঠের আগুনের ধোঁয়া, পাথর আর ভেড়ার গন্ধ। দেওয়াল থেকেই কুঁদে বার করা দোকানগুলো বেশ দূরে দূরে; জানিনের পাদুটো ধরে আসছে। কিন্তু তার স্বামীর মেজাজ উত্তরোত্তর ভালো হচ্ছে। বিক্রিবাটা হতে আরম্ভ করেছে, সাথে সাথে মার্সেলের মনও বেশ উদার হয়ে উঠছে; জানিনকে ডাকছে "খুকু" বলে; এত দূরে আসাটা তাহলে ব্যর্থ হয়নি। "অবশ্যই", জানিন আওড়ায়, "সোজাসুজি ওদের সাথে ব্যবসা করাই তো ভালো?"

অন্য একটা রাস্তা ধরে ওরা আবার চকের দিকেই ফিরে চলে। পড়ন্ত বিকেল; আকাশ এখন প্রায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার। চকে এসেই থামে ওরা। হাত কচলে মার্সেল দরদী চোখে সামনের তোরঙ্গটির দিকে দেখছে। "দেখ", বলে জানিন। চকের উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসছে এক লম্বা আরব; রোগা, তেজী, পরণে আকাশী রঙের বার্ণুস, বাদামী রঙের নরম জুতো, হাতে দস্তানা, তার রোদে পোড়া ক্ষুরধার মুখ গর্বভরে ওপরে তোলা। একটা, "শেশ" পাগড়ি করে পরেছে সে; তা নাহলে তার পোশাক স্থানীয় ব্যাপারের দায়িত্বে থাকা ফরাসী আধিকারিকদের মতই যাদের জানিন কখনো সখনো তারিফ করে। এক হাতের দস্তানা ধীরে ধীরে খুলতে খুলতে সে সোজা ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে, যদিও তার দৃষ্টি যেন আরো ওপাশে নিবদ্ধ। "বাঃ" চোখ নাচিয়ে বলে মার্সেল, "এ তো নিজেকে জেনারেল মনে করে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে সবারই মুখে এমনই অহঙ্কারের ছাপ; কিন্তু এই লোকটি সত্যি করেই মাত্রা ছাড়িয়েছে। চারিদিকে খোলা চক পড়ে আছে, তবু সে সোজা তোরঙ্গটার দিকে এগিয়ে এল, না সেটাকে দেখে, না তাদের দেখে। ওদের মধ্যে দূরত্ব আর নেই, আরবটি একেবারেই ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে; মার্সেল তাড়াতাড়ি তোরঙ্গটার হাতল ধরে টেনে একপাশে সরিয়ে নেয়। যেন কিছুই না দেখে লোকটি বেরিয়ে যায় পাশ কাটিয়ে, আগের মতই মাপা পদক্ষেপে এগিয়ে যায় প্রাচীরের দিকে। জানিন স্বামীর দিকে তাকায়, মার্সেল আবার মুষড়ে পড়েছে। "ওরা ভাবছে এখন যাই করুক না কেন পার

BanglaBook.org

পেয়ে যাবে", বলে সে। জানিন উত্তর দেয় না। আরবটির নির্বোধ ঔদ্ধত্যে তার বিতৃষ্ণা আসে, হঠাৎই মন খুব খারাপ হয়ে যায়। ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়, নিজের ছোট্ট ঘরের কথা মনে পড়ে। আবার হোটেলের হিমশীতল ঘরটিতে ফিরবার কথা ভাবতেই দমে যায় সে। আচমকা মনে পড়ে যে ম্যানেজার তাকে দুর্গপ্রাকারে উঠে মরুভূমি দেখতে বলেছিল। কিন্তু মার্সেল ক্লান্ত, খেতে যাওয়ার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে চায় সে। "প্লিজ", বলে জানিন। মার্সেল ওর দিকে তাকায়, দৃষ্টিতে হঠাৎই মনোযোগ। "বেশ তো, সোনা", বলে সে।

হোটেলের সামনে রাস্তায় তার জন্য অপেক্ষা করে জানিন। সাদা জোব্বা পরা মানুষের ভিড় বেড়েই চলেছে। একটিও মহিলা চোখে পড়ে না, জানিনের মনে হয় একসঙ্গে এত পুরুষ মানুষ সে কখনো দেখেনি। তবু একজনও তার দিকে তাকায় না। কেউ কেউ, যেন তাকে না দেখেই, ধীরে ধীরে তার দিকে তাদের রোগা তামাটে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়; জানিনের মনে হয় এদের সবারই যেন এমনই একইরকম মুখ, বাসের ফরাসী সৈনিকটির অথবা দস্তানা পরিহিত আরবটির মুখের মতই চাতুর্য আর অহঙ্কার মাখা। এই ভিনদেশী মহিলার দিকে তারা এমনই মুখ ঘুরিয়ে তাকায়, তাকে দেখেও না, তারপর নিঃশব্দে লঘুপদে তার চারিদিকে হেঁটে বেড়ায়। জানিনের পা ফুলে উঠছে। তার অস্বস্তি, এখান থেকে চলে যাওয়ার আকুতি বেড়েই চলেছে। "কেন যে এলাম।" কিন্তু এই তো মার্সেল ফিরে আসছে।

ওরা যখন দুর্গের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, তখন বেলা পাঁচটা। বাতাস একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন আকাশ এখন ঝকঝকে নীল। শীত এখন আরো শুকনো, কামড় দিচ্ছে তাদের গালে। অর্ধেক সিঁড়ি ওপরে, দেওয়ালের পাশে শুয়ে থাকা এক বৃদ্ধ আরব গাইড লাগবে কিনা শুধোল, কিন্তু নড়ল চড়ল না, যেন আগে থেকেই জানত যে ওরা না বলবে। সিঁড়ি বেশ লম্বা, মধ্যে মধ্যে মাটি দিয়ে বানানো বেশ ক'টা চাতাল থাকলেও খাড়া খুব। আস্তে আস্তে আরো খোলা জায়গায় উঠে আসছে ওরা, আলো আরো প্রশস্ত, ঠাণ্ডা ও শুকনো যেখানে মরুদ্যানের প্রতিটি শব্দ নির্ভুল ও পরিষ্কার কানে এসে ঠেকছে। উজ্জ্বল বাতাস তাদের চারিদিকে যেন কম্পিত হচ্ছে, তারা যত এগোচ্ছে কম্পনের দৈর্ঘ্যও চলেছে বেড়ে; যেন তাদের আগমন আলোক কেলাসের মধ্যে এক ক্রমবর্ধমান শব্দতরঙ্গের জন্ম দিয়েছে। ওপরে ওঠার পর, তাদের দৃষ্টি বিস্তৃত দিগন্তে খেজুরবনের পেছনে হারিয়ে যেতে না যেতেই, জানিনের মনে হল কেন গোটা আকাশটা এক সংক্ষিপ্ত তীব্র শব্দে কেঁপে উঠল, তার প্রতিধ্বনি ধীরে ধীরে চারিদিক ভরে ফেলল, তারপর আচমকাই হয়ে গেল স্তব্ধ, নিঃশব্দে অন্তহীন প্রান্তরের সামনে ফেলে গেল তাকে।

পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধীরে ধীরে দৃষ্টি বোলায় জানিন, কোথাও কোনো বাধা নেই, এক নিখুঁত বক্ররেখা। নিচে আরবি শহরের নীল সাদা রোয়াক একে অপরের মধ্যে গিয়ে মিশেছে, মধ্যে মধ্যে রোদে শুকোতে দেওয়া লঙ্কার লাল টকটকে ছোপ। কাকপক্ষিও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ভেতরের চত্বর থেকে রোস্ট কফির গন্ধর সাথে

BanglaBook.org

সাথে হাসিমাখা কণ্ঠস্বর আর দুর্বোধ্য পায়ের দাপাদাপি উঠে আসছে। দূরে, মাটির দেওয়াল দিয়ে ইতস্তত বিভক্ত খেজুর বনে ওপরের পাতা বাতাসে সরসর করে নড়ছে, যদিও এখানে দুর্গের ওপর সে বাতাসের ছোঁয়াও লাগছে না। আরো দূরে আদিগন্ত বিস্তৃত মেটে ও ধূসর রঙের পাথরের সাম্রাজ্যে প্রাণের চিহ্নও নেই। মরুদ্যান থেকে কিছুটা দূরে অবশ্য পশ্চিমের খেজুরবনের ওখানে নদীখাতের পাশে বড়ো বড়ো কালো তাঁবু দেখা যায়। তাদের চারিদিকে একদল নিশ্চল উট, দূরত্বে ক্ষুদ্রকায়, ধূসর মাটির ওপর গাঢ় রঙে কী যেন অদ্ভুত অক্ষর এঁকেছে, যার এখনো মর্মোদ্ধার হয়নি। মরুভূমির ওপর নৈঃশব্দ প্রান্তরের মতই বিশাল বিস্তীর্ণ।

পাঁচিলের গায়ে পুরো শরীর হেলান দিয়ে জানিন নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে, সামনের এই উন্মুক্ত শূন্য থেকে নিজেকে টেনে নিতে পারে না পাশে মার্সেল ছটফট করে। তর ঠাণ্ডা লাগছে; নিচে নামতে চায় সে। তাছাড়া এখানে দেখবার আছেই বা কী? কিন্তু জানিন দিগন্ত থেকে দৃষ্টি সরাতে পারে না। ওই ওখানে, আরো আরো দক্ষিণে, যেখানে আকাশ আর পৃথিবী মিশেছে এক নির্ভুল সরলরেখায়—ওখানেই যেন কী একটা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, কী একটা যার কথা সে এতদিন জানতই না, অথচ যার অভাব সে অনুক্ষণ টের পেয়েছে। পড়ন্ত বেলায় আলো ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে; কেলাস থেকে তরল। যুগপৎ, নেহাতই ভাগ্যক্রমে সেখানে আগত এক নারীর হৃদয়ে এতগুলো বছর এতদিনের অভ্যাস আর একঘেয়েমি যে গ্রন্থি বজ্রআঁটুনিতে বেঁধেছে তাও ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে। জানিন যাযাবরদের ছাউনির দিকে তাকিয়ে। ভেতরের লোকগুলিকে সে দেখেওনি; কালো তাঁবুগুলোর মধ্যে জনমানুষের সাড়া নেই, অথচ তার সমস্ত চিন্তা জুড়ে এখন এরাই, এই যাদের অস্তিত্বের কথা আজকের আগে সে জানত না পর্যন্ত। গৃহহীন, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, এই একমুঠো মাত্র মানুষ বিচরণ করছে তার সামনে ক্রমশ প্রকাশমান এই বিশাল এলাকায়, যা কিন্তু আসলে আরো বিশাল বিস্তারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র; যে-বিশালত্বের মাথা ঝিমঝিমে দৌড়-শেষ হয়েছে আরে হাজার হাজার মাইল দক্ষিণে, যেখানে প্রথম নদীটি অবশেষে জঙ্গলে জলসিঞ্চন করেছে। কালের উৎস থেকে, হাড় অবধি কুরে নেওয়া এই বিশুষ্ক পৃথিবীতে, অল্প কিছু মানুষ নিরন্তর হেঁটে চলেছে; তাদের কিছুই নেই, কিন্তু কারোর ভৃত্য নয় তারা; দারিদ্রক্লিষ্ট, অথচ এক আশ্চর্য জগতের তারা স্বাধীন নৃপতি। জানিন বুঝে উঠতে পারে না এই চিন্তা কেন তার মনে ভরে দেয় এমন এক মধুর অগাধ বিষণ্ণতার যে ওর দু'চোখ বুজে আসে। ও শুধু জানে যে এই জগৎ তার কাছে চিরদিনই প্রতিশ্রুত অথচ কোনদিনই তার হবে না, কখনোই না, বা হয়তো শুধুমাত্র এই ক্ষণিকের জন্য যখন সে আবার চোখ মেলে ধরবে হঠাৎই নিশ্চল আকাশ আর জমাট আলোর তরঙ্গের ওপর, যখন আরবি শহর থেকে ওঠা সমস্ত কণ্ঠস্বর আচম্বিতে স্তব্ধ হয়ে যাবে। ওর মনে হল যেন পৃথিবীর গতি হঠাৎই স্থির হয়ে পড়েছে, যেন সেই মুহূর্ত থেকে আর কেউ জরাগ্রস্ত হবে না। এখন থেকে সর্বত্রই জীবন বিলম্বিত—কেবল তার হৃদয়ে এখনো কে যেন যন্ত্রণায় আর বিস্ময়ে কেঁদে চলেছে।

BanglaBook.org

কিন্তু আলো আবার নড়তে থাকে; বিমল, তাপহীন সূর্য পশ্চিমে গোলাপি ছোঁয়া লাগিয়ে নেমে যায়, পূর্বদিকে এক ধূসর তরঙ্গ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, ধীরে ধীরে এই বিশাল বিস্তৃতির ওপর তা ছড়িয়ে যেতে প্রস্তুত। প্রথম একটি কুকুর ডেকে ওঠে। জানিনের খেয়াল হয় যে তার দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। "ঠাণ্ডায় জমে গেলাম", বলে মার্সেল। "বুদ্ধু! চলো ফেরা যাক।" কিন্তু সে স্ত্রীর হাত ধরে আড়ষ্টভাবে। বাধ্য মেয়ের মত পাঁচিল থেকে সরে এসে তার পিছু পিছু চলে জানিন। সিঁড়ির বৃদ্ধ আরবটি এক চুলও না নড়ে তাদের নামার দিকে তাকিয়ে থাকে। এক প্রবল ও আকস্মিক ক্লান্তিতে ন্যুব্জ হয়ে কারোর দিকেই না তাকিয়ে হেঁটে চলে জানিন, টেনে নিয়ে চলে দেহটিকে। যার ভার তার কাছে এখন অসহ্য বলে মনে হয়। তার স্ফূর্তি নির্বাপিত। তার মনে হয় এই যে জগতে সে প্রবেশ করেছে সেখানে সে যেন বড়ো অতিরিক্ত লম্বা, অতিরিক্ত স্থূল, মাত্রাতিরিক্ত সাদাও। একমাত্র এক শিশু, সেই তরুণী, সেই শুষ্ক লোকটি বা চোরা শেয়াল এই জগতে নিঃশব্দে হাঁটতে পারে। এখন থেকে নিজেকে নিদ্রার দিকে, মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া সে আর কীই বা করতে পারে।

আসলে রেস্তোরাঁর দিকে নিজেকে টেনে নিয়ে চলে সে দু'একবার নিজের ক্লান্তির কথা জানান দেওয়া ছাড়া তার স্বামী এখন একেবারে চুপচাপ। দুর্বলভাবে শীতের সঙ্গে যুঝে চলে জানিন, আঁচ করে ভেতরে ভেতরে জ্বর আসছে তার। একইভাবে নিজেকে টানতে টানতে বিছানায় নিয়ে যায় সে, মার্সেলও আসে, এসেই তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই আলোটা নিভিয়ে দেয়। ঘরে জমাট ঠাণ্ডা। জানিন অনুভব করে জ্বর বাড়ার সাথে সাথে ঠাণ্ডা তাকে আঁকড়ে ধরছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, ধমনীতে রক্ত বইছে কিন্তু উত্তাপের লেশমাত্র নেই; কেমন একটা ভয় তার ভেতরে দানা বেঁধে উঠছে। উপুড় হয়ে শোয়, পুরোনো লোহার খাট তার শরীরের চাপে কাতরে ওঠে। না, জানিন চায় না অসুস্থ হয়ে পড়তে। স্বামী ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে; ওকেও ঘুমোতে হবে; ঘুমোনো দরকার। ঘুলঘুলি দিয়ে শহরের নানা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসে। মরুদেশীয় কাফেগুলিতে পুরোনো ফোনোগ্রাফে নাকী সুরে গান বাজে, সেই কেমন যেন চেনা চেনা সুর ধীরগামী জনস্রোতের চাপা ওজনের সাথে ভেসে আসে। জানিনকে ঘুমোতে হবে। কিন্তু ও শুনে চলেছে কালো কালো তাঁবু, তার চোখের পাতার পেছনে নিশ্চল উটের দল জাবর কাটে; বিষম একাকীত্ব শাক দেয় অন্তরে। হ্যাঁ, ও কেন এল এখানে? এই প্রশ্নের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

একটু পরেই জেগে উঠল জানিন। চারিদিকে পূর্ণ স্তব্ধতা। কিন্তু শহরের প্রান্তে নিঃশব্দ রাত্রি বিদীর্ণ করছে কুকুরের দলের কর্কশ চিৎকার। জানিন শিউরে ওঠে। পাশ ফিরতেই স্বামীর কঠিন কাঁধের ছোঁয়া লাগে। হঠাৎই আধো ঘুমে স্বামীর গা ঘেঁষে জড়োসড়ো হয় সে। নিদ্রাস্রোতে ভেসে চলেছে কিন্তু ডুবছে না; সব থেকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে অচেতন ব্যগ্রতায় সেই কাঁধটিকেই আঁকড়ে ধরে সে। ও কথা বলছে কিন্তু কী বলছে তা নিজেই প্রায় শুনতে পাচ্ছে না। শুধু মার্সেলের উত্তাপ টের পাচ্ছে।

BanglaBook.org

কুড়ি বছরেরও বেশি দিন ধরে, প্রতিটি রাত্রে, এমনভাবেই তার উত্তাপের মধ্যে, তারা দু'জনে, অসুস্থ হলেও, বেড়াতে বেরোলেও, এখনের মতই... বাড়িতে একা একা আর কীই বা করত তারা? ছেলেপুলে নেই। এইটাই কি তার অভাব নয়? সে জানে না, সে শুধু মার্সেলের পেছনে পেছনে চলে, কারোর কাছে তার প্রয়োজন আছে এতেই তার আনন্দ। সে যে প্রয়োজনীয় এই খবরটুকুই মার্সেলের কাছ থেকে পাওয়া তার একমাত্র আনন্দ। হয়তো সে জানিনকে ভালোবাসে না। প্রেম যদি ঘৃণায় পরিপূর্ণও হয়, তবু তার তো এমন থমথমে মুখ হয় না। কিন্তু মার্সেলের মুখ কেমন? অন্ধকারে তারা মিলিত হয় কেবলমাত্র স্পর্শের মাধ্যমে, একে অপরকে না দেখেই। এই আঁধারের প্রেম ছাড়াও কি আর কোনো প্রেম আছে, যে প্রেম দিবালোকে চিৎকার করে উঠতে পারে? সে জানে না সে শুধু জানে যে মার্সেলের তাকে দরকার, আর এই প্রয়োজনকে সম্বল করেই দিবারাত্র বেঁচে আছে, বিশেষ করে রাত্রে—প্রতি রাত্রে, যখন মার্সেল একা থাকতে চায় না, চায় না জরা কিংবা মৃত্যুকে, যখন তার মুখে থাকে সেই একগুঁয়ে অভিব্যক্তি যা জানিন মাঝে মাঝে অন্য পুরুষদের মুখেও দেখতে পায়। এই অভিব্যক্তি সেই উন্মাদদেরই যারা ভুয়ো জ্ঞানের পেছনে লুকিয়ে থাকে যতক্ষণ না উন্মত্ততা তাদের সাপটে ধরে মরিয়া হয়ে ছুঁড়ে দেয় কোনো এক নারী শরীরের দিকে। একাকীত্ব ও রাত্রির দ্বারা প্রকাশিত সবরকম বিভীষিকাকে তারা সেখানেই, কোনরকম বাসনার তাড়না ছাড়াই, প্রোথিত করে।

তার কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্যই যেন মার্সেল নড়েচড়ে ওঠে। সে তাকে ভালবাসে না; জানিন যা নয় তার ভয় শুধু তাতেই। অনেকদিন আগেই তাদের উচিত ছিল আলাদা হয়ে অন্তিম দিন পর্যন্ত একাকী শোওয়া। কিন্তু চিরদিন কে একা শুতে পারে? মার্সেলের পক্ষে তো তা কখনোই সম্ভব নয়—সে তো দুঃখকষ্টের ভয়ে সদাভীত দুর্বল অসহায় শিশুর মত; বাস্তবিক জানিনেরই শিশু, জানিনকে যার ভীষণ দরকার; যে এই তো এখনই, কেমন যেন ককিয়ে উঠল। জানিন তার কাছে আরো ঘেঁসে আসে, তার বুকে হাত রাখে। মনে মনে তাকে সেই ভালবাসার নামে ডাকে, যে নাম তাকে একদিন সেই দিয়েছিল। এখনো, কখনো সখনো, কী বলছে তা ভালো করে না ভেবেই, তারা এই নাম ব্যবহার করে।

সে তাকে ডাকে, সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে। তারও যে দরকার তাকে, তার শক্তিকে, তার ছোটখাটো খামখেয়ালিপনাকে, তারও যে বড়ো ভয় মৃত্যুকে। "এই ভয়টাকে যদি জয় করতে পারতাম, তবে আনন্দে থাকা যেত...।" অমনি কি এক নাম না জানা যন্ত্রণা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ও সরে আসে মার্সেলের কাছ থেকে। না, কিছুকেই জয় করা তার হবে না, হবে না আনন্দে থাকা, সত্যিই মুক্তি না পেয়েই মরতে হবে তাকে। জানিনের হৃদয়ে বড়ো যন্ত্রণা; এক জগদ্দল ভারে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। আজ হঠাৎই সে আবিষ্কার করল কুড়ি বছর ধরে এই ভার সে বয়ে ফিরছে। সে মুক্তি চায়, তা সে মার্সেল বা অন্যরা কোনোদিন মুক্ত হোক বা না হোক। ঘুম একেবারেই কেটে গেছে। বিছানায় উঠে বসে জানিন যেন খুব কাছ থেকে আসা কোনো ডাক কান

BanglaBook.org

পেতে শোনে। কিন্তু রাত্রির প্রান্ত থেকে কেবলমাত্র মরুদ্যানের কুকুরদের পরিশ্রান্ত অথচ অদম্য ডাক তার কানে আসে। মৃদু বাতাস উঠেছে; খেজুরবনে তার লঘু জলের কুলুকুলু শুনতে পায় জানিন। শব্দটা আসছে দক্ষিণ থেকে, সেখানে মরুভূমি আর রাত্রি মিশেছে পুনর্বার পরিবর্তনরহিত আকাশের নিচে, যেখানে জীবন থমকে দাঁড়িয়েছে, যেখানে কেউ আর কখনো জরাগ্রস্ত হবে না, মারাও যাবে না। তারপর বাতাসের জলধারা শুকিয়ে যায়, একমাত্র মূক আহ্বান ছাড়া আর কিছু শুনেছিল কিনা সে ব্যাপারেই জানিন সন্দিহান হয়ে পড়ে, তাছাড়া সেই ডাক শোনা অথবা স্তব্ধ করে দেওয়া তো তারই হাত। কিন্তু এখনই তাতে সাড়া না দিলে আর কোনো দিনই তার অর্থ বোঝা হবে না। এখনই—হ্যাঁ, অন্ততঃ এইটুকু নিশ্চিত।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে খাটের পাশে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে জানিন, স্বামীর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনে। মার্সেল ঘুমে আচ্ছন্ন। পরমুহূর্তেই বিছানার তাপ তাকে ত্যাগ করে, শীত আঁকড়ে ধরে, খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে আসা রাস্তার আলোর ম্লান আভায় হাতড়াতে হাতড়াতে আস্তে আস্তে পোশাক পরে সে। জুতো হাতে করে দরজার কাছে পৌঁছায়। অন্ধকারে এক লহমা অপেক্ষা করে, তারপর সাবধানে দরজা খোলে। হাতলে ক্যাঁচ করে শব্দ হয়, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জানিন। তার হৃৎপিণ্ডে উন্মত্ত দাপাদাপি। কান পেতে থাকে সে, নৈশব্দে সাহস পায়, হাত আর একটু ঘোরায়। হাতলের ঘোরা যেন থামতেই চায় না। অবশেষে দরজা খোলে, জানিন পিছনে বেরিয়ে আসে, তারপর একই রকম সাবধানতায় দরজা বন্ধ করে। তারপর কাঠের গায়ে গাল চেপে ধরে অপেক্ষা করে। একটু পরেই, দূরে, মার্সেলের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ঠাহর হয়। ঘুরে দাঁড়াতেই মুখের ওপর রাত্রির হিমেল বাতাসের ঝাপটা, বারান্দা ধরে ছুটতে থাকে সে। হোটেলের দরজা বন্ধ। ছিটকিনি খুলতে পাহারাদার ঘুমচোখে সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়ায়, আরবিতে কি যেন বলে। "ফিরে আসব", বলে জানিন রাত্রির মধ্যে বেরিয়ে পড়ে।

কালো আকাশ থেকে নক্ষত্রের মালা ঝুলে আছে খেজুরগাছ আর বাড়িগুলির ওপর। দুর্গে যাবার এমন জনমানবহীন রাস্তা দিয়ে জানিন ছুটে চলে। সূর্যের সঙ্গে আর লড়তে হচ্ছে না, তাই শীত হুড়মুড়িয়ে আক্রমণ করেছে রাত্রিকে। বরফ জমাট বাতাস জানিনের ফুসফুসে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। তবু অন্ধকারে প্রায় অন্ধের মত ছুটে চলে সে। তবে রাস্তার ওদিকে আলো দেখা দেয়, তারপর এঁকেবেঁকে নেমে আসে ওর দিকে। থমকে দাঁড়ায় ঘুরন্ত চাকার শব্দ শুনতে পায়; তারপর ক্রমবর্ধমান আলোয় পলকা সাইকেলের চাকার ওপরে বিশাল বার্ণুস চোখে পড়ে। বার্ণুসের ঝাপ্টা লাগে তার গায়ে; তার পেছনে অন্ধকার থেকে লাফিয়ে বেরোয় তিনটে লাল আলো, মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। জানিন দুর্গের দিকে ছুটে চলে। অর্ধেক সিঁড়ি ওপরে, বাতাস তার ফুসফুসে এমনই কেটে বসে যে সে থামতে চায়। শেষ দমটুকু তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ছিটকে নিয়ে ফেলে প্রাকারের ওপর, তার পেট চেপে ধরে দেওয়ালের গায়ে। জানিন হাঁপায়, চোখের সামনে সব কিছুই ঝাপসা। এত ছুটে এসেও গরম তো লাগছে

BanglaBook.org

না, বরং তার সারা শরীরে কাঁপুনি। গোগ্রাসে টেনে নেওয়া ঠাণ্ডা বাতাস অবশেষে তার মধ্যে সমানভাবে বইতে থাকে, কাঁপুনির মধ্যে উত্তাপের ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। এক সময় রাত্রির বিস্তারের ওপর চোখ মেলে সে।

জানিনের চতুর্দিকের একাকীত্ব ও নৈঃশব্দ ভাঙতে নেই কোনো প্রশ্বাস, নেই কোনো শব্দ—শুধু মাঝে মাঝে পাথরের মৃদু মটমট শোনা যায়, ঠাণ্ডার প্রাবল্যে পাথরও হয়ে যাচ্ছে বালি। একটু পরে অবশ্য তার মনে হয় মাথার ওপরের আকাশ ধীরে ধীরে পাক দিচ্ছে। শুষ্ক, শীতল রাত্রির বিশালত্বে অগুনতি তারা অনবরত দেখা দিচ্ছে। চকচকে বরফখণ্ডের মত খসে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে, ধীরে ধীরে পিছলে নামছে দিগন্তের দিকে। ওই ভাসমান আলোকবর্তিকার থেকে চোখ সরিয়ে আনতে পারে না জানিন। তাদের সঙ্গে সেও ঘুরছে, এই আপাত স্থানু গতি ধীরে ধীরে তাকে অন্তরাত্মার সঙ্গে একীভূত করে, সেখানে তখন ঠাণ্ডা আর বাসনার দ্বৈরথ। চোখের সামনে তারাগুলি একের পর এক খসে পড়ে মরুভূমির পাথরের মাঝে নিবে যাচ্ছে, জানিনও রাত্রির কাছে একটু একটু করে উন্মুক্ত হচ্ছে। গভীর নিঃশ্বাস নিতে নিতে সে শীত ভুলে গেল, ভুলে গেল অন্যদের গুরুভার, জীবনের অবাস্তবতা বা প্রাণহীনতা, বেঁচে থাকা বা মরে থাকার প্রলম্বিত যন্ত্রণা। এতগুলো বছর ধরে পাগলের মত দিশাহীন হয়ে ছুটে বেড়ানোর পর, অবশেষে সে থমকে দাঁড়িয়েছে। যুগপৎ সে যেন তার শিকড় খুঁজে পায়, প্রাণরস ওঠে তার দেহ বেয়ে; শরীরের কাঁপুনিও গেছে থেমে। পুরো পেট দেওয়ালে চেপে ধরে সে ঘুরন্ত আকাশের দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে; তার উদ্বেল হৃদয় শান্ত হোক, অন্তরে স্তব্ধতা আনুক, এই তার প্রতীক্ষা। নক্ষত্রমণ্ডলের শেষ তারা ক'টি মরুদিগন্তের আরেকটু নিচে ঝরে পড়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর, অসহনীয় ধীরতায় রাত্রির জল জানিনকে ভরে ফেলতে থাকে, ঠাণ্ডাকে ডুবিয়ে, তার গহীন অন্তরাত্মা থেকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ সংক্ষোভে উঠে আসতে থাকে, এমনকি পৌঁছে যায় শীৎকার ধ্বনিত মুখে। পরমুহূর্তে, ঠাণ্ডা মাটির ওপর চিৎ জানিনের ওপর গোটা আকাশ টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে।

একই রকম সাবধানতা অবলম্বন করে জানিন যখন আবার ঘরে ফিরে আসে, মার্সেল তখনও ঘুমিয়ে। কিন্তু সে বিছানায় ঢুকতেই সে ককিয়ে ওঠে, কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎই উঠে বসে। কিছু বলেও, কিন্তু জানিন কিছুই বুঝতে পারে না। মার্সেল উঠে আলো জ্বালে, চোখ ধাঁধিয়ে যায় জানিনের। টলতে টলতে বেসিনের দিকে যায় মার্সেল, মিনেরাল ওয়াটারের বোতলে লম্বা চুমুক দেয়। চাদরের তলায় ঢুকতে যাবে, হঠাৎই বিছানায় একটা হাঁটু ভর দিয়ে, স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে কিছুই না বুঝে। জানিন হাপুস নয়নে কাঁদছে, থামতে পারছে না কোনো মতেই। "কিছু না, সোনা", বলে সে, "কিচ্ছু না।"

ফরাসী থেকে ভাষান্তর : অরূপ মণ্ডল

BanglaBook.org

বিশ্বাসঘাতক অথবা এক বিভ্রান্ত মন

"কী বিশৃঙ্খলা, কী বিশৃঙ্খলা। আমার মাথার মধ্যে খানিকটা শৃঙ্খলা আনা দরকার। যবে থেকে ওরা আমার জিভ কেটে নিয়েছে, আর একটা জিভ, মনে হয় আমার খুলির মধ্যে নড়াচড়া করে বিরামবিহীন, কিছু একটা কথা বলে, অথবা কেউ, চুপ হয়ে যায় হঠাৎ, তারপর আবার শুরু হয় সব, ওহ্ আমি এত কিছু শুনি, যা আমি কিন্তু বলি না, কী বিশৃঙ্খলা, এবং যদি আমি মুখ খুলি তবে শুধু নুড়ি নড়াচড়ার শব্দ। শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, জিভটা বলে, একই সঙ্গে জিভটা আবার অন্য বিষয়ের কথাও বলে, অবশ্য আমি সর্বদাই শৃঙ্খলা চেয়েছি। একটা ব্যাপার অন্ততঃ নিশ্চিত, আমার বদলি হিসাবে আসবে যে মিশনারী আমি তার অপেক্ষা করছি। এখানে এখন আমি পথের উপরে, তাগাজা থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে, পাথর স্তূপের আড়ালে, পুরানো বন্দুকটার উপর বসে। মরুভূমিতে সূর্য উঠছে, এখনো বেশ ঠাণ্ডা, এখনই ভীষণ গরম হবে, এই দেশ লোককে পাগল করে দেয়, এবং এত বছর ধরে আমি এখানে যে হিসাব হারিয়ে ফেলেছি...না আরও একটু অপেক্ষা। মিশনারীটি আসবেই আজ সকালে অথবা সন্ধ্যায়। আমি শুনেছি সে আসবে একজন গাইড নিয়ে, হতে পারে একটা উটই থাকবে ওদের দুজনের। আমি অপেক্ষা করব, আমি অপেক্ষা করছি, ঠাণ্ডাটা, ঠাণ্ডাই আমাকে কাঁপাচ্ছে আর একটু ধৈর্য ধর, নোংরা ক্রীতদাস।

"আমি কত দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে আছি। যখন আমি বাড়ি ছিলাম, মধ্য মাসিফ-এর উঁচু মালভূমিতে, আমার রুক্ষ বাবা, আমার নিষ্ঠুর মা, মদ, শুয়োরের মাংসের সূপ প্রতিদিন, সর্বোপরি মদ, টক এবং ঠাণ্ডা, আর লম্বা শীত, হিমেল হাওয়া, তুষারপাত, বিরক্তিকর পাহাড়ী গাছ, ওঃ! আমি পালাতে চেয়েছিলাম, এক ধাক্কায় ওদের ছাড়তে চেয়েছিলাম, শুরু করতে চেয়েছিলাম অবশেষে বাঁচতে, সূর্যালোকে, পরিষ্কার জলের সাথে। আমি যাজককে বিশ্বাস করেছিলাম, তিনি আমাকে ধর্ম শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তিনি প্রতিদিন আমাকে নিয়েই পড়ে থাকতেন, ওর সময়ের অভাব ছিল না এই প্রটেস্ট্যান্ট দেশে যেখানে গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় উনি দেওয়ালগুলো আলিঙ্গন করতেন। উনি আমাকে বলতেন ভবিষ্যতের কথা, সূর্যালোকের কথা, ক্যাথলিসিজমই হল সূর্য বলতেন উনি আর পড়াতেন আমাকে, আমার নিরেট মাথায় ল্যাটিন ঢুকিয়েছিলেন উনি 'ওই ছোটটা বুদ্ধিমান কিন্তু একটা খচ্চর', আসলে এত নিরেট আমার খুলি যে আমার সারা জীবন, এত পতন সত্ত্বেও, কখনও রক্তপাত হয়নি ঃ 'গরুর মাথা' শুয়োর বাবাটা বলতেন। সেমিনারে ওরা থাকত গর্বে ডগমগ, প্রটেস্ট্যান্ট দেশ থেকে একজন নতুন সভ্য, সেটা একটা জয়, ওরা আমাকে অভ্যর্থনা

BanglaBook.org

করল যেন ওস্তেঅ্যারলিঅ্সে ওঠা সূর্য। সূর্যটা বিবর্ণ, নিশ্চিতভাবেই, অ্যালকোহলই কারণ, ওরা টক মদ গিলেছে আর ওদের সন্তানরা পেয়েছে গর্তওয়ালা দাঁত, উচিত ছিল যে যার নিজের বাপকে মারা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয় নেই যে তিনি মিশনের কাজে মেতে উঠবেন কারণ তিনি বহুকাল আগেই মৃত, টক্কে যাওয়া মদ শেষ পর্যন্ত ওর পেট ফুটো করে দিয়েছিল, সুতরাৰ মিশনারীকে খুন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

"আমার কিছু বোঝাপড়া করার আছে ওর সঙ্গে এবং ওর মনিবদের সঙ্গে, আমার মনিবদের সঙ্গে যার আমাকে ঠকিয়েছে, নোংরা ইওরোপের সঙ্গে, সকলেই আমাকে ঠকিয়েছে। মিশন, একটাই কথা ওদের মুখে লেগে আছে, যেতে হবে বর্বরদের কাছে আর বলতে হবে তাদের ঃ "এই আমার ঈশ্বর, তাকিয়ে দেখ, উনি আঘাত করেন না, প্রাণও নেন না, উনি আদেশ করেন মধুর স্বরে, উনি অন্য গালটা বাড়িয়ে দেন, উনি সকল ঈশ্বরের সেরা ঈশ্বর, ওকে বরণ কর, দেখ কেমন আমাকে সকলের সেরা বানিয়েছেন, আমাকে আঘাত কর, তোমরা তার প্রমাণ পাবে।" হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করেছিলাম, আমার ভাল লাগছিল, আমি মোটা হচ্ছিলাম, আমার রূপ খুলে যাচ্ছিল, আমি অপমান চাইছিলাম। গ্রীষ্মকালে গ্রনবল-এর রোদে, যখন আমরা ঘন কালো সারি বেঁধে যেতাম আর পাশ দিয়ে যেত পাতলা পোশাক পরা মেয়েরা, আমি চোখ ফেরাতাম না, আমি ওদের তাচ্ছিল্য করতাম, আমি চাইতাম ওরা আমাকে অপমান করুক আর ওরা হাসত মাঝে মাঝে। আমি তখন ভাবতাম ঃ "ওরা আমাকে মারুক আর আমার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিক", কিন্তু, সত্যি বলতে কি, নানা ঠাট্টায় ভরা ওদের দাঁত বার করা হাসিতে ব্যাপারটা একই দাঁড়াত, এই অপমান আর দুঃখ ছিল মধুর। যখন আত্মোদয়ের বর্ণনা করছিলাম যিনি শুনছিলেন তিনি আমাকে বুঝতে পারেন নি ঃ 'না, না আপনার মধ্যে রয়েছে ভালো!' ভালো! আমার মধ্যে আছে টক মদ, ব্যস্, এবং সেই ভালো, ভালো হওয়া যাবে কি করে যদি না কেউ খারাপ হয়, আমি কথাটা ভালোই বুঝেছি ওরা আমাকে যা কিছু শিখিয়েছে তার থেকে। আমি এমনকি এই একটিমাত্র ধারণা এবং আমি একটি বুদ্ধিমান খচ্চর, সব ব্যাপারে, শেষ অবধি গেছি, বাড়াবাড়ি রকমের প্রায়শ্চিত্ত করেছি, সাধারণ ব্যাপারে, শেষ অবধি গেছি, বাড়াবাড়ি রকমের প্রায়শ্চিত্ত করেছি, সাধারণ ব্যাপারেও বাহুল্য বর্জন করেছি, মোদ্দা কথা, আমি চেয়েছিলাম আমিও একজন আদর্শ হই, যাতে লোকে আমার দিকে তাকায় এবং আমাকে দেখার মধ্য দিয়ে সম্মান জানায় যিনি আমাকে ভালো করেছেন তাকে, আমার মধ্য দিয়ে প্রণাম জানায় আমার ঈশ্বরকে।

"রুদ্রমূর্তি সূর্য! সূর্য উঠছে, মরুভূমি পাল্টে যাচ্ছে, পাহাড়ী নরম তুষার, না সে এখন ধূসর-হলুদ রঙের, বিশাল ঝলমলানির আগের ম্যাড়ম্যাড়ে মুহূর্তটি। কিছুই নেই, আমার সামনে আদিগন্ত কিছুই নেই, ঐ অবধি যেখানে মালভূমি অদৃশ্য হয়ে গেছে এখনও নানান রঙের বৃত্তে। আমার পিছনে, চলার পথ উঠে গেছে বালিয়াড়ি পর্যন্ত যাতে ঢাকা পড়েছে আগাছা, যে লৌহ-কঠিন নামটা এত বছর ধরে আমার মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্ রয়েছে। এই নামটার কথা প্রথম যিনি আমাকে বলেছিলেন তিনি হলেন

BanglaBook.org

কানা বৃদ্ধ পাদ্রী, যিনি কনভেন্টে অবসর কাটাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রথম কেন, উনিই একমাত্র, এবং আমার কথা বলতে গেলে, তার গল্পের যা আমাকে আঘাত করেছিল তা দিনের শহরটা কি ঝাঁঝালো রোদের মধ্যে সাদা দেওয়ালগুলো নয়, না, তা হল বর্বর শহরবাসীদের নিষ্ঠুরতা, এবং শহরটার একটা ব্যাপার যে তা সমস্ত বিদেশীর জন্য বন্ধ, যারা ওতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে একজন, মাত্র একজনই, ওর জ্ঞানমতে, বলতে পেরেছিল যা সে দেখেছিল। ওরা ওকে চাবুক মেরে ক্ষতস্থানে আর মুখে নুন ঢুকিয়ে মরুভূমির মধ্যে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এই একবারই সে যাযাবরদের দেখেছিল, একটু সহানুভূতিসম্পন্ন, নেহাতই ভাগ্য, আর আমি, সেই থেকে, আমি স্বপ্ন দেখে গেছি ওর গল্পের, নুন আর আকাশ বিচ্ছুরিত আগুনের, আরাধ্য দেবতাস্থানের এবং তার ক্রীতদাসদের, এর থেকেও কি বেশী বর্বর, বেশী উত্তেজক আছে, হ্যাঁ, ওখানেই ছিল আমার কর্তব্য কাজ, ওদের দেখানোর দরকার ছিল আমার ঈশ্বরকে।

"ওরা আমাকে নিরুৎসাহ করার জন্য সেমিনারে আমাকে অনেক বুঝিয়েছেন, বলেছেন যে অপেক্ষা করাটা জরুরী, ওটা মিশনারী কাজের দেশ নয়, আমি এখনও তৈরী হইনি, আমার নিজেকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যিক, জানা দরকার আমি কে, সবশেষে হবে আমার পরীক্ষা, তারপরে দেখা যাবে। কিন্তু অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা, আহ্! না, হ্যাঁ যদি কেউ চায়, বিশেষ প্রস্তুতি এবং পরীক্ষায় রাজী যেহেতু সেগুলি আলজে-তে হয় এবং এগুলি আমাকে গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি নিয়ে যাবে কিন্তু বাদবাকী ব্যাপারে আমি আমার নিরেট মাথাটা নাড়লাম এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি করলাম, বর্বরতমদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং তাদের মত করে জীবনযাপন করা, তাদের দেখিয়ে দেওয়া যে আমার ঈশ্বরই সবচেয়ে বড় সত্য। ওরা আমাকে অপমানিত করবে, সন্দেহ নেই, কিন্তু অপমানগুলি আমার ভয় জাগায় না, অপমানগুলি আমার প্রমাণের পক্ষে দরকারী এবং এগুলি সহ্য করার ভঙ্গির মাধ্যমে আমি এই বর্বরগুলিকে প্রভুত্ব করব, সর্বশক্তিশালী সূর্যের মতো। সর্বশক্তিমান, হ্যাঁ, এই শব্দটাই আমার জিভে লেগে থাকত সর্বদা, আমি স্বপ্ন দেখতাম অসীম ক্ষমতার, যা শত্রুকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করে, আত্মসমর্পণ করতে, তাকে শেষ অবধি ধর্মান্তরিত করা, এই হল আমাদের পাদ্রীদের সাদামাঠা আদর্শ, এত বেশী ক্ষমতা তবু এত কম সাহস, আমি এজন্য ওদের ঘৃণা করি, ওদের নিষ্ঠা নেই এবং আমার ওটা আছে, আমি অত্যাচারীদের কাছ থেকেই স্বীকৃতি চাই, আমি ওদের হাঁটু গেড়ে বসিয়ে ওদের দিয়ে বলাতে চাই ঃ "ঈশ্বর, এই নাও তোমার জয়", সংক্ষেপে, এক পাদ্রী সেনাবাহিনীকে শাসন করতে চাই শুধু কথা দিয়ে। এ বিষয়ে ভাল তর্ক করতে পারার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম, অন্য কোনভাবে আমি আত্মবিশ্বাসী নই কখনও, কিন্তু যখন কোন আইডিয়া আমার এসে যায়, আমি তা ছাড়ি না, এটাই আমার শক্তি, আমার নিজস্ব শক্তি, যার জন্য ওদের ছিল করুণা।

"সূর্য আরও এগিয়েছে আমার কপাল জ্বলতে শুরু করেছে। আমার চারিদিকের

BanglaBook.org

পাথর নিঃশব্দে ফাটছে, শুধু বন্দুকের নলটা ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা তৃণভূমির মত, ঠাণ্ডা বহুদিন আগের এক সন্ধ্যায় বর্ষণের মতো, যখন মৃদু জ্বালে রান্না হচ্ছিল সুপটা, আমার অপেক্ষায় ছিলেন ওরা, আমার বাবা ও মা, মাঝে মুখে খেলছিল মৃদু হাসি, আমি ওদের ভালবাসতাম সম্ভবতঃ। কিন্তু সেসব অতীত, তাপের একটা আবরণ উঠতে শুরু করেছে চলার পথ থেকে, এক মিশনারী, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, আমি এখন জানি কিভাবে বার্তার উত্তর দিতে হবে, আমার নতুন প্রভুরা আমাকে সে শিক্ষা দিয়েছে এবং আমি জানি ওরাই ঠিক, ভালবাসার হিসাব মেটাতেই হবে। আলজে-র সেমিন্যারি থেকে আমি যখন পালালাম আমি এই বর্বরদের অন্যরকম কল্পনা করেছিলাম, আমার কল্পনাগুলির একটি জিনিসই শুধু সত্য ছিল, ওরা সত্যিই পাজী। আমি কোষাধ্যক্ষের বাক্স থেকে চুরি করেছি, ধড়াচূড়া ছেড়েছি, আমি আফ্রিকার আটলাস পর্বত, উচ্চ মালভূমি এবং মরুভূমি পার হয়েছি, আন্তঃসাহারা যোগাযোগ পথের ড্রাইভার আমাকে ঠাট্টা করছিল "ঐখানে যেও না", এই লোকটাও, হলোটা কি সকলের, পার হয়েছি শত শত কিলোমিটারের বালির ঢেউ, এলোমেলো, হাওয়ায় এগোচ্ছে আবার পিছোচ্ছে, এবং আবার পাহাড়, কালো শিখর, ধারালো ইস্পাতের মতো, এরপর একজন গাইডের দরকার হল যাওয়ার জন্য যেখানে রয়েছে বাদামী রঙের নুড়ির এক সমুদ্র, অন্তহীন, উত্তাপে গন্‌গন্ করছে, জ্বলছে হাজারটি আগুনের আয়নায়, ঐ জায়গাটা অবধি যেটা হল কালো মানুষ সাদা দেশের সীমান্ত, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে নুনের শহর। আর সেই টাকাগুলো যা গাইডটা আমার কাছ থেকে চুরি করেছিল, সরল বুদ্ধি যে ওগুলো ওকে দেখিয়েছিলাম, কিন্তু লোকটি আমাকে পথে এনে ছেড়ে দিয়েছিল, এইখানটাতে ঠিক ঠিক, তার আগে আমাকে আঘাত করেছিল, "কুকুর, ঐ হল রাস্তাটা যা দেখিয়ে আমি বর্তে গেলাম, যা, যা ওখানে, ওরা তোকে বুঝিয়ে দেবে", এবং ওরা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, হ্যাঁ, ওরা হল সূর্যের মতো রাত্রি ছাড়া আঘাত করতে থামে না, তেজ আর গর্বের সঙ্গে, যা এই মুহূর্তে আমাকে আঘাত করে যাচ্ছে তীব্রভাবে, খুবই তীব্র, হঠাৎ মাটি থেকে আসা জ্বলন্ত বর্শার আঘাতের মতো, ওহ্ আশ্রয়, হ্যাঁ আশ্রয়ের সন্ধানে যাও, বড় পাথরটার নীচে, সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার আগে।

ছায়াটা এখানে ভালই। কি করে বাঁচা যায় ওই নুনের শহরটায়, গনগনে উত্তাপে ভরা গামলার গর্তে? গাইতির কোপে বানানো, স্থূলভাবে সমান করা প্রতিটি খাড়া দেওয়ালের উপর গাইতির তৈরি গর্তগুলি চোখবাঁধানো আলো ভরা, হাল্কা রঙের ছড়ানো-ছিটানো বালি দেওয়ালগুলিকে হলুদাভ করে দেয় একটু, শুধু যখন বাতাস খাড়া দেওয়াল আর চত্বরকে পরিষ্কার করে দেয় তখন সবকিছুই এক ঝলমলে সাদায় ঝকঝক করে, সীমা অবধি পরিচ্ছন্ন আকাশের নীচে। আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম, সেইসব দিনগুলিতে যখন নিশ্চল আগুন চত্বরগুলির মেঝেতে পট্‌পট্ আওয়াজ করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, চত্বরগুলি মনে হোত একসঙ্গে জুড়ে আছে, যেন অতীতের কোন একদিন ওরা একসঙ্গে নুনের পাহাড়টাকে আক্রমণ করছিল, ওটাকে প্রথমে থেবড়ে

BanglaBook.org

দিয়েছিল, তারপর সেই পিণ্ডটাকে খুঁড়ে কেটে তৈরী করেছে রাস্তা, বাড়ীর ভিতরটা, জানালা, অথবা যেন, হ্যাঁ, সেটার সম্ভাবনাই বেশি, ওরা ওদের জ্বলন্ত এবং সাদা নরকটাকে কেটে বার করেছে, ফুটন্ত জলের তীব্র প্রক্ষেপণে, শুধু দেখানোর জন্যে যে ওরা সেখানে থাকতে জানে যেখানে কেউ তা পারেনি কোনদিন, যা সর্ব জীবিত প্রাণী থেকে তিরিশ দিনের পথ, মরুভূমির মাঝখানে ঐ গর্তে। যেখানে দিনের আলোর তাপ মানুষে মানুষে সর্ব যোগাযোগ অসম্ভব করে দেয়, তাদের মধ্যে খাড়া করে দেয় ফুটন্ত স্ফটিক আর অদৃশ্য অগ্নিশিখার দুর্গকপাট, যেখানে পরিবর্তনের জন্য সামান্য সময়ও না দিয়ে রাত্রির ঠাণ্ডা নুনপাথরের মধ্যে তাদের জমিয়ে দেয় একজন একজন করে, শুকনো ভাসমান বরফ ক্ষেত্রে রাত্রির অধিকারী, ইগলুর মধ্যে হঠাৎ ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকা কালো এস্কিমো। কালোই বটে, ওদের পরিধানের বস্ত্র লম্বা আর কালো এবং যে নুন ওদের নখ অবধি ঢেকে দেয়, ওরা মেরু রাত্রির ঘুমে তিক্তভাবে জাবর কাটে, যে নুন ওরা উজ্জ্বল গর্তের একমাত্র উৎস থেকে আসা জলের সঙ্গে পান করে তা ওদের কালো পোষাকে ছাপ রেখে যায় অনেকটা বৃষ্টির পরে শামুকের চলার পথের মতো।

"বৃষ্টি, হে ঈশ্বর, একটিবার মাত্র বৃষ্টির মতো বৃষ্টি, অনেকক্ষণ, ঝমঝমে, তোমার আকাশের বৃষ্টি। তাহলে শেষ অবধি, কুরে কুরে ক্ষয়ে যাওয়া ভয়ঙ্কর শহরটা ধীরে ধীরে সুনিশ্চিতভাবে ভেঙে পড়বে, পুরোপুরি গলে যাবে এক আঠালো স্রোতে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার হিংস্র অধিবাসীদের বালির দিকে। একটিমাত্র বৃষ্টি, ঈশ্বর। কিন্তু, বলছি, কোন্ ঈশ্বর, ওরা নিজেরাই হচ্ছে প্রভু! ওরা ওদের বন্ধ্যা গৃহের উপর প্রভুত্ব করে, প্রভুত্ব করে কালো ক্রীতদাসদের উপর ওরা মরতে বাধ্য করে খনিতে এবং কেটে বার করা প্রতিটি নুনের চাঁই দক্ষিণের দেশগুলিতে একটি মানুষের দানের সমান, ওরা হেঁটে যায়, নিঃশব্দে, শোকের পোষাকে নিজেদের ঢেকে রাস্তার খনিজ শুভ্রতার মধ্য দিয়ে এবং রাত্রি এলে যখন সারা শহর মনে হয় এক দুধ সাদা মায়ামূর্তি, ওরা ঢোকে, ঘাড় নীচু করে বাড়ীর ছায়ায় যেখানে নুনের দেওয়ালগুলি ক্ষীণভাবে জ্বলে। ওরা ঘুমোয়, ভারহীন ঘুম, এবং জেগে উঠেই ওরা আদেশ দেয়, পেটায় আর বলে ওরা হচ্ছে এক অখণ্ড জাতি, ওদের দেবতাই একমাত্র সত্য এবং সকলকে তা মানতে হবে। ওরাই আমার প্রভু, ওরা দয়া জানে না এবং প্রভুর মতোই ওরা একা থাকতে চায়, একা এগোতে চায়, একা শাসন করতে চায়, যেহেতু ওরা একাই স্পর্ধা করেছিল নুন আর বালির মধ্যে শীতল অত্যুষ্ণ এক শহর গড়ে তোলার। আর আমি...

"কী বিশৃঙ্খলা যখন গরম চড়তে থাকে, আমি ঘেমে চাই, ওরা কোনদিন না, এখন ছায়া অবধি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, আমার মাথার উপরের পাথরে পড়া সূর্যকে আমি অনুভব করতে পারছি, সূর্যটা আঘাত করছে, হাতুড়ির মতো সমস্ত পাথরের উপর আঘাত করছে এবং এ হচ্ছে এক সঙ্গীত, বহুদূর প্রসারিত দুপুরের সঙ্গীত, শত শত কিলোমিটারের উপর পাথর এবং বাতাসের কম্পনরা আমি অতীতের মতো নৈঃশব্দ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এই একই নৈঃশব্দ, সেটা কয়েক বছর আগের ব্যাপার, আমাকে

BanglaBook.org

অভ্যর্থনা করেছিল যখন প্রহরীরা নিয়ে গেল আমাকে ওদের কাছে, রোদ্দুরের মধ্যে, শহরের মাঝখানে খোলা জায়গায়, যেখান থেকে একটু একটু করে এককেন্দ্রিক চত্বরগুলি উঠে গেছে ঐদিকে যে দিকে নীল কঠিন আকাশের ঢাকনা বসে আছে গামলার ধারগুলির উপর। আমি ওখানেই ছিলাম, সাদা ঢালটার গর্তে এক ধাক্কায় হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হল আমাকে, চারিদিকের দেওয়াল থেকে আসা আগুন আর নুনের তরবারি বিঁধিয়ে দিচ্ছিল আমার চোখ, ক্লান্তিতে ফ্যাকাসে, গাইডের দেওয়া ঘুষিতে রক্তাক্ত কান, আর ওরা, লম্বা, কালো আমাকে দেখছিল কিছু না বলে। ঠিক দুপুরবেলা ছিল। লৌহ সূর্যের আঘাতে, আকাশ অণুরনিত হচ্ছিল দীর্ঘক্ষণ ধরে, লৌহপাত উত্তাপে সাদা, সেই একই নৈঃশব্দ এবং ওরা আমাকে দেখছিল, সময় এগিয়ে যাচ্ছিল, আমাকে ওদের দেখা শেষই হচ্ছিল না, আর আমি ওদের দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলাম না, আমি ক্রমশঃই আরো হাঁপাচ্ছিলাম, আমি কেঁদে ফেললাম শেষ পর্যন্ত, এবং সহসা ওরা নিঃশব্দে আমার দিকে পিছন ফিরল এবং সকলে একসঙ্গে একই দিকে চলে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে, আমি শুধু দেখতে পেলাম, লাল আর কালো চটিতে নুনে চক্‌চক্ করা ওদের পাগুলো, লম্বা কালো পোশাক একটু ওঠানো, পোশাকের শেষটা একটু খাড়া, পায়ের গোড়ালি মাটিতে হাল্কাভাবে আঘাত করছে এবং জায়গাটা খালি হয়ে গেল ওরা আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওদের মন্দিরে।

"উবু হয়ে বসে, যেমনভাবে আজকে পাথরের আড়ালে এবং আমার মাথার উপরের আগুন ফুটো করে দিচ্ছে পাথরের ঘনত্ব, আমি কয়েকদিন মন্দিরের অন্ধকারে রইলাম, যেটি অন্য বাড়ীগুলির চেয়ে একটু উঁচুতে, নুনের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, কিন্তু জানালা ছাড়া, ঝিকিমিকি রাত্রিতে ভরা। কিছুদিন, ওরা আমাকে দিত এক বাটি নোনতা জল আর কিছু শস্যদানা, যা আমার সামনে ছুড়ে দেওয়া হত মুরগীর মতো, আমি তা কুড়িয়ে নিতাম। দিনের বেলায়, দরজা বন্ধ থাকত এবং তবু অন্ধকার হাল্কা হয়ে যেত, যেন অপ্রতিরোধ্য সূর্য নুনের পিণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় সফল হয়েছিল। কোন বাতি ছিল না, কিন্তু পার্টিশন দেওয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে হেঁটে দেওয়াল সাজানো তালপত্রের মালাগুলো স্পর্শ করতাম এবং একেবারে পিছনে, একটি ছোট দরজা, বাজেভাবে বানানো, যার তালাটা আমি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম। কিছুদিন, বেশ পরে, আমি দিন গুনতে পারতাম না, না ঘণ্টা, কিন্তু ওরা আমাকে এক মুঠো করে শস্য দান বার দশেক ছুঁড়ে দিয়েছিল এবং আমি একটা গর্ত খুঁড়ে নিয়েছিলাম আমার মলমূত্রের জন্য যা আমি বৃথাই ঢাকার চেষ্টা করতাম, খোঁয়াড়ের দুর্গন্ধ সর্বদাই ভাসত, বেশ পরে, দরজাটার দুটো পাল্লাই খুলে গেল এবং ওরা ঢুকল।

"ওদের মধ্যে একজন আমার দিকে এল, আমি তখন এক কোণায় হাঁটু গেড়ে বসে। আমি আমার গালে নুনের আগুনে তাপটা বোধ করছিলাম, আমি তাদের ধুলোমাখা গন্ধ শ্বাস নিচ্ছিলাম, আমি ওকে এগোতে দেখছিলাম। আমার কাছ থেকে মিটার খানেক দূরে ও থামল, আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, অভিব্যক্তিহীন

BanglaBook.org

জ্বলজ্বলে ধাতব চোখ, ওর বাদামী রঙের ঘোড়ার মুখে বসানো, তারপর হাতে ওঠালো। নির্বিকারভাবেই, ও আমার নীচের ঠোঁটটা ধরে মোচড়াতে থাকল ধীরে ধীরে, যতক্ষণ না মাংস ছিঁড়ে আসে এবং আঙ্গুল না সরিয়ে আমাকে বাধ্য করল ঘুরে ঘরের মাঝখানে পিছিয়ে আসতে, ও এমনভাবে আমার ঠোঁটটা টানল যে আমি হাঁটুর উপরে পড়লাম, ঐখানেই, বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত মুখ, তারপরে সে ঘুরে গেল, দেওয়াল বরাবর সারি বেঁধে দাঁড়ানো অন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে। হাট করে খোলা দরজা দিয়ে আসা দিনের ছায়াশূন্য অসহ্য আলোয় ওরা আমাকে গোঙাতে দেখছিল, এবং ঐ আলোর মধ্যে উদয় হল তান্ত্রিক, তালপাতার চুল, বুক ঢাকা মুক্তো বসানো বর্ম; খড়ের ঘাগরার নীচে অনাবৃত পা, নলখাগড়া আর তারের মুখোশ যাতে চোখের জন্য দুটো চৌকো ফুটো করা আছে, তার পিছনে পিছনে গায়কেরা এবং মহিলারা, যাদের ভারী নানা বিচিত্র রঙের পোশাক তাদের শরীর সম্পর্কে কোন ধারণা করারই অবকাশ দেয় না। ওরা পিছনের দিকের দরজার সামনে নাচল। কিন্তু বেতাল স্থূল প্রকৃতির নাচ, ওরা শরীরটা নাড়াচ্ছিল, ব্যস এই পর্যন্ত, এবং শেষে তান্ত্রিকটি আমার পিছনের ছোট দরজাটি খুলল, মনিবেরা নড়ল না, ওরা আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমি ঘুরলাম আর মূর্তিটাকে দেখলাম, তার দুটো মুখ কুড়োল আকারের, তার লোহার নাক সাপের মত মোচড়ানো।

"ওরা আমাকে টেনে নিয়ে গেল, বেদীর পাদদেশে, ওরা আমাকে কালো রঙের জল খাওয়ালো, তিতো, তিতো, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা জ্বলতে শুরু করল, আমি হাসতে থাকলাম, ওটা অপরাধ, তাই আমার উপর অপরাধ করা হল। ওরা আমার পোশাক খুলে নিল, মাথা আর শরীর কামিয়ে দিল, তৈলস্নান করাল, নুন আর জলে ভেজানো দড়ি দিয়ে আমার মুখটায় বাড়ি মারল, আর আমি হাসছিলাম আর মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিলাম কিন্তু প্রতিবারেই, দুই মহিলা আমার কান দুটো ধরছিল এবং আমার মুখটাকে তান্ত্রিকের মারের সামনে এগিয়ে দিচ্ছিল, আমি তান্ত্রিকের চৌকো চোখদুটো শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম, আমি হেসেই যাচ্ছিলাম, রক্তে মাখামাখি হয়ে। ওরা থামল, কেউ কথা বলছিল না, আমি ছাড়া, মাথার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ইতিমধ্যেই শুরু হসেয়ছে, তারপরে ওরা আমাকে উঁচু করে ধরল এবং বাধ্য করল আমার চোখ মূর্তির দিকে তুলতে, আমার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে পুজো করার জন্য সেবা করার জন্য আমি এখনো উৎসর্গীকৃত হয়েছি, না, আর হাসছিলাম না, ভয় আর যন্ত্রণা আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছিল। এবং ওখানে, ঐ সাদা বাড়ীটাতে, তার দেওয়ালগুলির মধ্যে, যে দেওয়ালগুলি সূর্য তার তেজে পুড়িয়ে দিচ্ছিল বাইরে থেকে, উত্তেজনায় টানটান মুখে, ফ্যাকাশে স্মৃতি নিয়ে, হ্যাঁ, আমি মূর্তিটাকে পুজো করার চেষ্টা করলাম, মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই, এবং এমনকি ওর ভয়ঙ্কর মুখ বাদবাকী পৃথিবীর তুলনায় কম ভয়ঙ্কর ছিল। সেই তখন ওরা আমার গোড়ালি দুটো একটা দড়ি দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দিল যাতে আমি এক পা এক পা করেই শুধু হাঁটতে পারি, ওরা আবার নাচল, কিন্তু এবার মূর্তির সামনে, মনিবেরা এক এক করে চলে গেল।

BanglaBook.org

"দরজাটা ওদের পিছনে বন্ধ হলে, আবার বাজনা এবং তান্ত্রিকটা গাছের ছালে আগুন ধরিয়ে তার চারপাশে পা ঠুকতে থাকল। ওর লম্বা ছায়া সাদা দেওয়ালের কোণাগুলিতে ভেঙে যাচ্ছিল, দেওয়ালের উপরের সমতলটায় কাঁপছিল, সারা ঘরটাকে নৃত্যরত ছায়ায় ভরিয়ে দিচ্ছিল। ও এক কোণায় একটি আয়তক্ষেত্র দাগ দিল, যেখানে মহিলারা আমাকে টেনে নিয়ে গেল, আমি অনুভব করছিলাম ওদের শুকনো নরম হাত, ওরা আমার কাছাকাছি একপাত্র জল আর কিছু পরিমাণ শস্যদানা রাখল এবং মূর্তিটার দিকে ইঙ্গিত করল, আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে আমার দৃষ্টি ওর উপর নিশ্চল রাখতে হবে। তারপর তান্ত্রিক ওদের ডাকল, এক এক করে আগুনের কাছে, ওদের মধ্যেকার কয়েকজনকে ও পেটাল, তারা গোঙাতে থাকল, এবং পরে তারা মূর্তিটার, আমার দেবতার, সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল, আর সেই সময় তান্ত্রিক নাচতে থাকল এবং পরে ঘর থেকে মহিলাদের সকলকে বার করে দিলে একজন ছাড়া কমবয়সী যুবতী, বাদকদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে, যাকে এখনও পেটানো হয় নি। তান্ত্রিক ওকে ধরে মুঠিতে চুলের গোছা জড়িয়ে উত্তরোত্তর জোরে মোচড়াতে থাকল, মেয়েটি পিছন দিকে ঢলে পড়তে থাকল, বিস্ফারিত চোখ, শেষ অবধি চিৎ হয়ে পড়ল। তান্ত্রিক ওকে ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, বাদকেরা দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরালো, সেই সময় চৌকো চোখের মুখোশের পিছন থেকে চীৎকারটা বেড়ে একটা অসম্ভব স্তরে পৌঁছতে থাকল, এবং মেয়েটি মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকল খানিকটা মৃগীরোগিনীর মত এবং অবশেষে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে, জোড়া হাতে মাথা লুকিয়ে, মেয়েটিও চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু চাপাভাবে, এবং এই অবস্থায়, চিৎকার না থামিয়ে এবং মূর্তির দিক থেকে চোখ না সরিয়ে, তান্ত্রিক ওকে তাড়াতাড়ি, নোংরাভাবে ভোগ করল। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না, পোশাকের ভারী ভাঁজের মধ্যে তা এখন লুকোনো। আর আমি, নিঃসঙ্গতার ফলে, আমিও চেঁচিয়েছি, হ্যাঁ মূর্তিটার দিকে ভয়ে গলা ফাটিয়েছি যতক্ষণ না একটা লাথি আমাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে ফেলে দিল, নুনের তাল কামড়ালাম, যেমন আজ কামড়াচ্ছি পাথর, জিভবিহীন মুখ দিয়ে, যাকে খুন করতেই হবে তার অপেক্ষায়।

এখন সূর্য মধ্য গগন পার হয়ে একটু এগিয়েছে। পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে, আটিম দেখতে পাচ্ছি আকাশের অতিতৃপ্ত ধাতুতে সূর্যের বানানো ফুটোটা, আমার মুখের মতো বাচাল, এবং রঙহীন মরুর উপরে বিরামহীনভাবে যা বমি করে যায় অগ্নি প্রবাহ। আমার সামনের পথে, কিছুই নেই, দিগন্তে একটি ধূলিকণাও নেই, আমার পিছনে ওরা আমাকে নিশ্চয়ই খুঁজছে না, এখনও নয়, বিকেলের শেষেই শুধু ওরা দরজাটা খুলতো এবং আমি একটু বেরোতে পারতাম, সারাদিন মন্দিরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পরে, নতুন সাজিয়ে আর, সন্ধ্যায়, শুরু হতো অনুষ্ঠান যখন আমি প্রায়ই মার খেতাম, অনেক সময় খেতাম না, কিন্তু সর্বদাই মূর্তিটির সেবা করতাম, মূর্তি যার প্রতিকৃতি লোহায় খোদাই করা আছে আমার স্মৃতিতে এবং এখন আমার আশায়। কোনদিন কোন দেবতা আমাকে এতখানি বশ করে রাখে নি, রাখে নি দাস

BanglaBook.org

করে, আমার সমস্ত জীবন রাত্রি এবং দিন ঐ দেবতায় উৎসর্গীকৃত, এবং যন্ত্রণার অনুপস্থিতি, সেও কি আনন্দ নয়, ওর কাছে ঋণী এবং এমনকি, হ্যাঁ, কামনা-বাসনাও, প্রায় প্রত্যেক দিন ঐ নৈর্ব্যক্তিক এবং নোংরা কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সুবাদে, যে কর্মকাণ্ড আমি শুনতাম কিন্তু দেখতাম না, যেহেতু আমাকে এখন তাকিয়ে থাকতে হত দেওয়ালে নইলে পিটুনি। কিন্তু মুখটা থাকত নুনে ঠেসে ধরা মনটা অধিকার করে থাকত দেওয়ালের উপর ছুটোছুটি করতে থাকা পাশবিক ছায়াগুলি, আমার কানে আসত দীর্ঘ চিৎকার, একটা যৌনতাহীন জ্বলন্ত বাসনা আমার মাথা আর পেট চেপে ধরত। এইভাবে একটা দিনের পিছনে আর একটা দিন আসত, আমি একের থেকে অন্যকে আলাদা করতে পারতাম না, যেন দিনগুলো গলে যেত দারুণ উষ্ণতা আর নুনের দেওয়ালের গোপন কম্পনে, সময় শুধু অবয়বহীন ঢেউয়ের মৃদু ছলছল শব্দ যেখানে নিয়মিত ব্যবধানে আছড়ে আমার পাথরের বাড়ীটার উপর হিংস্র সূর্যটার মতো রাজত্ব করত, এবং এখন যেমন আগে, আমি দুর্ভাগ্য এবং কামনায় বিলাম করছি, এক বিদ্বেষময় আশা আমার মধ্যে জ্বলছে, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাই, আমি বন্দুকের নলটা আর তার ভিতরের আত্মাকে চাটছি, তার আত্মা, কেবলমাত্র বন্দুকেরই আত্মা থাকে, ওহ্। হ্যাঁ, যে দিন ওরা আমার জিভ কেটে নিয়েছে আমি ঘৃণার অমর আত্মাকে পুজো করা শিখেছি।

"কী বিশৃঙ্খলা, কী উন্মত্ত আবেগ, রা রা, তাপ আর ক্রোধে উন্মত্ত আমি উপুড় হয়ে শুয়ে আছি আমার বন্দুকের উপর। কে হাঁপাচ্ছে এখানে? আমি আর সহ্য করতে পারছি না এই তাপ যার শেষ নেই, এই অপেক্ষা, আমার ওকে খুন করতেই হবে। একটা পাখী নেই, এক টুকরো ঘাস নেই, পাথর, উষর বাসনা, নৈঃশব্দ, ওদের চিৎকার, আমার ভিতরের ঐ জিভটা যে কথা বলে এবং যবে থেকে ওরা আমাকে বিকলাঙ্গ করেছে, দীর্ঘ, একঘেয়ে, সঙ্গী বিবর্জিত যন্ত্রণাভোগ, যা এমনকি রাত্রির জলটুকু থেকেও বঞ্চিত, রাত্রি যার স্বপ্ন আমি দেখতাম, দেবতার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার, আমার নুনের আস্তানায়। কেবলমাত্র রাত্রি, ঠাণ্ডা তারা আর অন্ধকার ফোয়ারায় ভরা রাত্রি, পারত আমাকে বাঁচাতে, মানবজাতির পাজি দেবতাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে, কিন্তু সর্বদাই ঘরে আটকানো, আমি তা ভাবতে পারতাম না। যদি লোকটি আরও বিলম্ব করে, আমি অন্তত রাত্রিটাকে দেখব মরুভূমির উপরে উঠতে এবং আকাশ ছেয়ে ফেলতে, শীতল সোনালী আঙ্গুরক্ষেত্র ঝুলবে মাথার ঠিক উপরে অন্ধকার আকাশ থেকে, যেখানে আমি পান করতে পারব ইচ্ছামত, সিক্ত করতে পারব এই কালো আর শুকিয়ে যাওয়া গর্তটাকে যাকে কোন নমনীয় আর জীবন্ত মাংসপিণ্ড আর সজীব করে না, ভুলে যেতে পারব শেষ অবধি সেই দিন যখন পাগলামি কেড়ে নিয়েছিল আমার জিভ।

"কী গরমটাই পড়েছিল, গরম, নুন গলে যাচ্ছিল, অন্তঃত আমার তাই মনে হচ্ছিল, বাতাস আমার চোখ কুরে কুরে নিচ্ছিল, এবং তান্ত্রিক বিনা মুখোশে ঢুকল। ওর পিছন পিছন এল ধূসর রঙের ছিন্ন নেকড়ার তলায় প্রায় নগ্ন একটি মেয়ে

BanglaBook.org

মন্দিরের মূর্তির মুখোশের আদলে সারা অংশে উল্কি করা তার মুখটা একটি অপদেবতার বাজে হতবুদ্ধিভাব ছাড়া কিছুই প্রকাশ করছিল না। যখন তান্ত্রিক খুপচি ঘরের দরজাটা খুলল, মেয়েটির জীবন্ত অঙ্গ বলতে শুধু তার পাতলা চ্যাপ্টা শরীরটা দেবতার পায়ের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে। তারপর তান্ত্রিক আমার দিকে না তাকিয়ে চলে গেল, তাপ বাড়ছিল, আমি নড়ছিলাম না, মূর্তিটি আমাকে দেখছিল এক মনে ঐ নিশ্চল শরীরটার উপর দিয়ে। কিন্তু শরীরটার পেশীগুলি নাড়াচ্ছিল ধীরে ধীরে এবং মেয়েটির মূর্তির-আদলের-মুখ পাল্টালো না যখন আমি এগোলাম। শুধু ওর চোখদুটো আমার উপরে স্থির হয়ে বড় বড় হয়ে উঠল, আমার পা ওর পাকে স্পর্শ করল, তখন তীব্রভাবে বেড়ে গেল, এবং মেয়েটি, বিনা বাক্যব্যয়ে, ওর বিস্ফারিত চোখ আমার উপর সর্বদাই স্থির রেখে, একটু একটু করে পিছনে হেলে চিৎ হয়ে গেল, পা দুটো ধীরে ধীরে নিজের দিকে গুটিয়ে আনল, এবং তুলে ধরল। হাঁটুদুটি শান্তভাবে ফাঁক করতে করতে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, রা, তান্ত্রিকটা আমার দিকে ওৎ পেতে ছিল, ওরা সকলে ঢুকে পড়ল এবং মেয়েটির কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিল, পাপের জায়গায় বেদম পেলাল আমাকে, পাপ! কিসের পাপ, আমি হাসছি, কোথায় সেটা, কোথায় পুণ্য, ওরা আমাকে দেওয়ালে আছড়ে ফেলল, একটা ইস্পাতের হাত আমার চোয়ালদুটো শক্ত করে ধরল, অন্য হাত আমার মুখ খুলল, জিভটাকে টেনে বার করে দিল, পশুর মত চিৎকার করছিল সে কি আমি, একটি তীক্ষ্ণ, শীতল স্পর্শ, হ্যাঁ ঠাণ্ডা অবশেষে আমার জিভের উপর দিয়ে গেল। যখন আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম, আমি রাত্রিতে একা, দেওয়ালে সেটে আছি, শুকনো রক্তে ঢাকা, অদ্ভুত গন্ধের লতা-পাতায় আমার মুখ ভরা, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে না কিন্তু জিভ নেই, সেই শূন্যতায় রয়ে গেছে শুধু এক তীব্র যন্ত্রণা। আমি উঠতে চাইলাম, আমি আবার পড়ে গেলাম, খুশী, ভীষণভাবে খুশী শেষ পর্যন্ত মরার জন্য, মৃত্যুও শীতল এবং তার ছায়ায় কোন দেবতার আশ্রয় নেই।

"আমি মরলাম না, এক নতুন ঘৃণা উঠে দাঁড়াল একদিন, আমার সঙ্গে সঙ্গেই, হেঁটে গেল পিছনের দরজার দিকে, দরজাটা খুলল, বন্ধ করল আমার পিছনে, আমি ঘৃণা করতে থাকলাম আমার নিজের মানুষদের, মূর্তিটা ওখানে রয়েছে এবং, যে গহ্বরে আমি ছিলাম তার তলদেশ থেকে মূর্তিটাকে পুজো করার চেয়েও বেশি কিছু আমি করেছি, আমি ওকে বিশ্বাস করেছি এবং সেদিন পর্যন্ত যা কিছু বিশ্বাস করেছিলাম তা অস্বীকার করেছি। জয় হোক, মূর্তিটাই ছিল শক্তি এবং ক্ষমতা, ওকে ধ্বংস করা যায়, ধর্মান্তরিত করা যায় না, আমার মাথার উপর দিয়ে ওর দৃষ্টি ছিল শূন্য এবং মরচে পড়া। জয় হোক, মূর্তিটাই ছিল মনিব, একমাত্র প্রভু, যার তর্কাতীত গুণ ছিল, বিদ্বেষবুদ্ধি, মঙ্গলবুদ্ধি মনিব হয় না। এই প্রথম, অপরাধগুলোর জন্য, সারা শরীর চিৎকার করছিল শুধু একটি যন্ত্রণায়, আমি ওর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম আর মেনে নিয়েছিলাম ওর অমঙ্গলময় সম্প্রদায়কে, আমি ভালোবেসেছিলাম ওর মধ্যে পৃথিবীর অন্যায় নীতিগুলি। ওর রাজত্বে বন্দী, নুনের পাহাড় তেকে কেটে বার করা

BanglaBook.org

নুনের শহরটা, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, মরুভূমির ক্ষণজন্মা দুষ্প্রাপ্য ফুলগুলি ফুটে ওঠা থেকে বঞ্চিত, সেইসব ঘটনা থেকে সংরক্ষিত যা আকস্মিক বা মাধুর্যময়, একখণ্ড অপরিচিত মেঘ, প্রবল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এক বর্ষণ, যার স্বাদ পায় এমনকি সূর্য অথবা বালুকারাশি, এককথায় শৃঙ্খলার শহর, সমকোণ, চতুষ্কোণ ঘর, একরোখা পুরুষ, অত্যাচারিত, ঘৃণায় ভরা মন, আমি স্বেচ্ছায় ওর নাগরিক হয়েছিলাম, যে দীর্ঘ ইতিহাস আমাকে আগে শেখান হয়েছিল যে আমি অস্বীকার করেছিলাম। আমাকে ভুল শিখিয়েছে, একমাত্র অমঙ্গলের শাসনই বিচ্যুতিশূন্য, আমাকে ভুল শিখিয়েছে, সত্য হচ্ছে চৌকো, ভারী, ঘন, সূক্ষ্ম তারতম্য তার সহ্য হয় না, মঙ্গল হল একটা স্বপ্নবিলাসিতা, যেকোন কর্মপরিকল্পনা মুলতুবী রাখতে হয় অসংখ্যবার আর অনুসরণ করতে হয় ক্লান্তিকর প্রচেষ্টায়, একটা লক্ষ্য যা কেউ স্পর্শ করে না, মঙ্গলের শাসন অসম্ভব। অমঙ্গলই পারে শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে আর নিরঙ্কুশভাবে শাসন করতে, ওকেই সেবা করতে হবে ওর প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করার জন্য, পরে দেখা যাবে কি করা যায়, পরে কথাটার মানেই বা কি, কেবলমাত্র অমঙ্গলই বর্তমান, নিপাত যাক ইওরোপ, যুক্তি এবং মর্যাদা ও ক্রুশ। হ্যাঁ, আমাকে অবশ্যই ধর্মান্তরিত হতে হবে আমার মনিবদের ধর্মে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ক্রীতদাস ছিলাম, কিন্তু আমিও যদি পাজী হই আমি আর ক্রীতদাস থাকছি না, হোক আমার পা শৃঙ্খলিত আর আমার মুখ বোবা। ওহ্! ঐ তাপ আমাকে পাগল করে দেয়, অসহ্য আলোর নীচে মরুভূমি চিৎকার করে সর্বত্র, আর ও অন্যজন, দয়াময় ঈশ্বর, যার নামটাই বিতৃষ্ণা জাগায়, আমি ওকে স্বীকার করি না, কারণ ওকে এখন আমি চিনতে পেরেছি। ও স্বপ্ন দেখত এবং মিথ্যে বলতে চেয়েছিল। ওরা ওর জিভ কেটে নিয়েছিল যাতে ওর কথা আর না পৃথিবীকে ভুল বোঝায়, ওরা এমনকি ওর মাথায় পেরেক বিঁধিয়ে দিয়েছিল, বেচারা ওর মাথা, আমার মাথার মত এখন, কী বিশৃঙ্খলা, কী ক্লান্ত আমি, এবং পৃথিবী তো কাঁপেনি, আমি সে ব্যাপারে নিশ্চিত, একজন ধার্মিককে ওরা মেরেছিল তা ঠিক নয়, আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে রাজী নই, ধার্মিক কেউ নেই। আছে পাজী মনিবেরা যারা অদম্য সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। হ্যাঁ, মূর্তিটারই আছে সেই শক্তি, ওই হচ্ছে এই পৃথিবীর একমেবাদ্বিতীয়ম্ দেবতা, ঘৃণা হচ্ছে তার আদেশ, সমস্ত প্রাণের উৎস, শীতল বারিধারা, মেন্থলের মত শীতল যাতে গলা ঠাণ্ডা হয় আর পেট জ্বলে।

"আমি অন্যরকম হয়ে গেছি, ওরা তা বুঝেছিল, যখন ওদের সঙ্গে দেখা হত আমি ওদের হাতে চুমো খেতাম, আমি ওদেরই একজন হয়েছিলাম, ওদের প্রশংসায় ক্লান্তিশূন্য আমি, আমি ওদের বিশ্বাস করতাম, আমি আশা করতাম ওরা আমার লোকদের সেইভাবে অঙ্গহানি করবে যেভাবে ওরা আমার অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। এবং যখন আমি জানলাম যে মিশনারীরা আসছে আমি বুঝে গেলাম কি আমার অবশ্য কর্তব্য। সে দিনটা অন্য দিনগুলোর মতই, সেই একই চোখ ধাঁধানো দিনের আলো এত দীর্ঘ সময় ধরে প্রবাহিত হচ্ছে। শেষ বিকালে, এক পাহারাদারকে হঠাৎ দেখা গেল উদয় হতে, গামলার উপরটায় দৌড়োচ্ছে, এবং কয়েক মিনিট বাদে, আমাকে টেনে

BanglaBook.org

নিয়ে যাওয়া হল মন্দিরে, দরজা বন্ধ হল। ওদের মধ্যে একজন আমাকে মাটিতে ঠেসে ধরে রাখল, অন্ধকারে, তার ক্রুশ-আকৃতির তরবারির ভয় দেখিয়ে, এবং অনেকক্ষণ নৈঃশব্দ্যের পর শহরটা, যা সাধারণত শান্তিপূর্ণ থাকে, ভরে গেল এক অপরিচিত কোলাহল, কয়েকটা কণ্ঠস্বর যা চিনতে আমার অনেকক্ষণ কেটে গেল যেহেতু তা ছিল আমার নিজের ভাষায়, কিন্তু যে মুহূর্তে কণ্ঠস্বরগুলি অনুরণিত হল, তরবারির অগ্রভাগ নেমে এল আমার চোখ দুটির ওপরে, আমার পাহারাদার তাকিয়ে রইল আমার দিকে নিঃশব্দে। তারপর কাছাকাছি এল দুটো কণ্ঠস্বর যা এখনও আমার কানে বাজে, একটি স্বর জানতে চাইছে ঐ মন্দিরটায় পাহারাদার কেন, দরজা ভেঙে ফেলতে হবে কি না, আমার লেফটেন্যান্ট, অন্য স্বর বলছে "না", সংক্ষিপ্ত গলায়, তারপর যোগ করছে, এক মুহূর্ত পরে, যে একটা সমঝোতা হয়েছে, শহরটা বিশ সৈন্যের একটা বাহিনী মেনে নেবে এই শর্তে যে ওরা থাকবে চৌহদ্দীর বাইরে এবং স্থানীয় রীতিনীতিকে সম্মান জানাবে। সৈন্যটা হাসল ওরা হার মেনে নিয়েছে কিন্তু অফিসার জানে না, যাইহোক এই প্রথম বাচ্চাদের যত্ন নেওয়ার জন্য ওরা কাউকে গ্রহণ করছে, এবং সে হবে যাজক, পরে পুরো অঞ্চলটার ব্যাপারে কিছু করা যাবে। অন্য কণ্ঠস্বরটি বলল যে ওরা যাজকের ঐটা কেটে নেবে বুঝতেই পারছ কোনটা যদি সৈন্যরা ওখানে না থাকে ঃ "ওহ্। না, অফিসার জবাব দিল, এবং এমনকি পাদ্রী বেফর্ সৈন্যদের আগে আসবেন, উনি এখানে দুদিনের মধ্যে পৌঁছোবেন।" আমি আর কিছু শুনছিলাম না, চলনশক্তিহীন তরবারির নীচে মাটিতে, আমার যন্ত্রণা হচ্ছিল, সূঁচ আর ছোরার একটা চক্র আমার মধ্যে ঘুরছিল। ওরা পাগল হয়ে গেছে, ওরা পাগল হয়ে গেছে, ওরা নাক গলাতে দিচ্ছে শহরটা, অজেয় ক্ষমতাতে, প্রকৃত দেবতাতে, এবং ঐ অন্য যে লোকটি আসছে, ওরা ওর জিভ কেটে নেবে না, কোন মূল্য না দিয়ে ও বড়াই করবে তার উদ্ধত ভালমানুষীর, অপমান সহ্য না করে। অমঙ্গলের রাজত্ব পিছিয়ে যাবে, আবার সন্দেহ আসবে, আবার লোকে সময় নষ্ট করবে অবাস্তব ভালোত্বের স্বপ্ন দেখে, একমাত্র বাস্তব রাজত্বের আগমন ত্বরান্বিত করার বদলে ওরা নিষ্ফল প্রচেষ্টায় নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে এবং আমি দেখছিলাম তরবারিটা যা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, হে শক্তি যা একমাত্র পৃথিবীকে শাসন করে। হে শক্তি, এবং শহরটা আস্তে আস্তে কোলাহলমুক্ত হল, দরজাটা অবশেষে খুলল, আমি একলা রয়ে গেলাম, তাপিত, তিক্ত, মূর্তির সঙ্গে এবং আমি ওর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি আমার বিশ্বাসকে, আমার প্রকৃত মনিবদের, আমার স্বৈরতন্ত্রী ঈশ্বরকে বাঁচাবার এবং চরম বিশ্বাসঘাতকতা করার, তার জন্য আমাকে যাই মূল্য দিতে হোক না কেন।

"রা, তাপ একটু কমেছে, পাথর আর কাঁপছে না, আমি আমার গর্তের বাইরে আসতে পারি, দেখতে পারি মরুভূমিটা ঢেকে যাচ্ছে এক এক নানা রঙে হলুদ এবং গৈরিক, ঠিক পরেই বেগনি। সেই রাত্রি আমি অপেক্ষা করছিলাম ওদের ঘুমোবার, আমি দরজার তালাটা অচল করে দিয়েছিলাম, আমি বেরিয়ে গেলাম অভ্যাস মত পদক্ষেপে, দড়ি দিয়ে মাপা, আমি রাস্তাগুলি চিনতাম, আমি জানতাম কোথা থেকে

BanglaBook.org

নিতে হবে পুরোনো বন্দুকটা, কোন বেরোবার পথে পাহারাদার নেই, এবং এখানে পৌঁছোলাম এমন প্রহরে যখন এক মুঠো তারা ঘিরে রাত্রি ফ্যাকাশে হচ্ছে আর মরুভূমির রঙ হচ্ছে ঘন। আর এখন, আমার মনে হচ্ছে কত দিন কত দিন হয়ে গেল আমি পাথরের নীচে কুঁজো হয়ে আছি। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, ওহ্, ওরা তাড়াতাড়ি আসুক না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা খোঁজা শুরু করতে যাচ্ছে, চারিদিকের রাস্তা থেকে ওরা উড়ে আসবে, ওরা জানবে না যে আমি চলে এসেছি ওদের জন্য এবং ওদের আরো ভালভাবে সেবা করার জন্য, আমার পা দুটো দুর্বল, ক্ষুধা আর ঘৃণায় মাতাল। ও ও ঐ ওখানে, রা রা, ঐ পথের শেষে দুটো উট বড় হচ্ছে, পা তুলে দৌড়োচ্ছে, সংক্ষিপ্ত ছায়াতে ইতিমধ্যেই জোড়া জোড়া দেখাচ্ছে, চিরকালের মতোই ওরা দৌড়োচ্ছে তেজী আর স্বপ্নালু ভঙ্গিতে। ওরা এখানে অবশেষে এখানে।

"বন্দুক, তাড়াতাড়ি, এবং আমি তাড়াতাড়ি ঘোড়া টানছি। ও মূর্তি, আমার ঐ ওখানকার দেবতা, তোমার শক্তি অক্ষত থাকুক, অপরাধ বাড়তে থাকুক, অভিশপ্তদের পৃথিবীকে ঘৃণা শাসন করুক ক্ষমাহীনভাবে, পাপী হোক চিরস্থায়ী মনিব, সেই রাজত্ব শেষ পর্যন্ত আসুক যেখানে নুন আর লোহার একটিমাত্র শহরে কালো অত্যাচারীরা ক্রীতদাস বানাবে এবং তাদের অধিকারে রাখবে বিনা করুণায়। এবং এখন, রা রা গুলি চলুক করুণার উপরে, গুলি চলুক অক্ষমতা ও তার পরোপকারের উপরে, গুলি চলুক যা কিছু পাপের আগমনকে বিলম্বিত করে, গুলি চলুক দুবার, এবং ঐ ওখানে ওরা উল্টে গেল, পড়ে গেল, এবং উটরা সোজা পালালো দিগন্তের দিকে, যেখানে এক ঝাঁক কালো পাখী উড়ে গেল অপরিবর্তিত আকাশের দিকে। আমি হাসছি, আমি হাসছি, ঐটা তার ঘৃণিত পোষাকে মোচড়াচ্ছে, এই লোকটা মাথাটা একটু তুলল, আমাকে দেখল, আমাকে, তার শৃঙ্খলিত সর্বশক্তিমান প্রভুকে, কেন আমার দিকে হাসল, আমি ঐ হাসি গুঁড়ো করে দেব। ভালোত্বের মুখে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাতের আওয়াজ কী ভালো আজ, আজ অবশেষে, সব কাজ সম্পূর্ণ এবং মরুভূমির সর্বত্র, এখান থেকে কয়েক ঘণ্টা দূরেও শিয়ালেরা ধৈর্যের সঙ্গে, তাদের জন্য অপেক্ষা করা মৃতদেহের ভোজের দিকে। জয়! আমি হাত প্রসারিত করলাম করুণাময় আকাশের দিকে, একটা বেগনী ছায়া উল্টে পারে অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, ও ইওরোপের রাত্রিরা, জন্মভূমি, শৈশব, কেন জয়ের মুহূর্তে আমাকে কাঁদতে হচ্ছে?

"লোকটা নড়ে উঠল, না, শব্দটা অন্য কোথা থেকে আসছে, অন্য দিক থেকে ঐ ওখানে ওরা এক ঝাঁক কালো পাখীর মত দ্রুত আসছে, ওরা আমার মনিবেরা, ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর, আমাকে পাকড়াও করল, আহ্! আহ্! হ্যাঁ, আঘাত কর, ওরা ভয় পাচ্ছে প্রতিশোধপরায়ণ সৈন্যদের যাদের আমি ডেকেছি, এইরকমই হওয়া উচিত ছিল, এই পবিত্র শহরে। নিজেদের রক্ষা কর এখন, আঘাত কর আমাকে আঘাত কর প্রথমে, সত্য তোমাদের দিকে। ও আমার মনিবেরা, ওরা সৈন্যদের জয় করবে তারপরে, ওরা জয় করবে কথা এবং প্রেম ওরা মরুভূমি অতিক্রম করবে, সমুদ্র পার হয়ে যাবে, ইওরোপের আলো ঢেকে দেবে ওদের কালো আবরণ দিয়ে, পেটের উপরে মারো, হ্যাঁ,

BanglaBook.org

চোখের উপরে মারো, ওদের নুন ছড়িয়ে দেবে মহাদেশজুড়ে, সমস্ত গাছপালা, সমস্ত যৌবন বিনষ্ট হবে, এবং বোবা জনতা শৃঙ্খলিত পায়ে আমার পাশে এগোবে প্রকৃত বিশ্বাসের নিষ্ঠুর সূর্যের নীচে পৃথিবীময় মরুভূমিতে, আমি আর একা থাকব না। আহ্! যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণা ওরা আমাকে দিচ্ছে, ওদের রোষাগ্নি ভাল এবং সামরিক জিনের উপরে যেখানে ওরা এখন আমাকে চারদিক থেকে টেনে চার টুকরো করছে, দুঃখের কথা, আমি হাসছি, আমি ভালবাসি সেই আঘাত যা পেরেক ঠুকে আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করে দিচ্ছে।

কী রকম নিঃশব্দ মরুভূমিটা। এখনই রাত হয়ে গেল এবং আমি একা, আমার তেষ্টা পেয়েছে। আরো অপেক্ষা; শহরটা কোথায়, ঐ দূর থেকে আসছে ঐ শব্দগুলো, এবং সৈন্যরাই সম্ভবতঃ জয়ী, না তা যেন অবশ্যই না হয়, যদি বা সৈন্যরা জয়ী হয়, ওরা যথেষ্ট পাজী নয়, ওরা শাসন করতে পারবে না, ওরা এখনও বলবে যে ভালো হওয়া দরকার, এবং তবুও থাকবে লক্ষ লক্ষ মানুষ পাপ ও পুণ্যের মাঝে, ছিন্নভিন্ন, বিভ্রান্ত, ও মূর্তি কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ? সব শেষ হয়ে গেল, আমার তেষ্টা পেয়েছে, আমার শরীর জ্বলছে, আলোহীন রাতে আমার চোখদুটো ভরে গেল।

"এই দীর্ঘ স্বপ্ন, আমি জেগে উঠছি, কিন্তু না, আমি মরে যাচ্ছি, ঊষার উদয় হচ্ছে, প্রথম আলো, দিন, অন্য জীবিতদের জন্য, আর আমার জন্য অপ্রতিরোধ্য সূর্য, মাছি। কে কথা বলছে, কেউ না, আকাশ ফাঁক হচ্ছে না, না, ঈশ্বর মরুভূমিতে কথা বলেন না, তবু কোথা থেকে আসছে ঐ স্বর যা বলছেঃ "তুমি যদি মরতে রাজী হয়ে যাও ঘৃণার জন্য ক্ষমতার জন্য, কে আমাদের ক্ষমা করবে?" এ কি আমার মধ্যেকার আর একটা জিভ অথবা সেই অন্য জন যে মরতে চায় না, আমার পায়ের উপরে এবং যে বলতেই থাকেঃ "সাহস, সাহস, সাহস?" আহ্। যদি আবার ভুল করে থাকি। একদা ভ্রাতৃসম মানুষেরা, একমাত্র অবলম্বন, ও নিঃসঙ্গতা, ত্যাগ কোরো না আমাকে। এই তো, এই তো, কে তুমি, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, রক্তাক্ত মুখ, সে তুমি, তান্ত্রিক, সৈন্যরা তোমাকে হারিয়েছে, ঐ ওখানে নুন জ্বলছে, এ তো তুমি আমার মনিব প্রাণসখা। ত্যাগ করো ঐ ঘৃণার মুখ, ভালোমানুষ হও এখন, আমরা ভুল করেছিলাম, আমরা আবার শুরু করব, ক্ষমাময় শহরটাকে আমরা নতুন করে গড়ব, বাড়ী ফিরে যেতে চাই আমি। হ্যাঁ সাহায্য কর আমাকে, তাই তো বলছি, তোমার হাত বাড়াও, দাও..."

এক মুঠো নুন বাচাল ক্রীতদাসের মুখ ভরে দিলে।

ফরাসী থেকে ভাষান্তর : অজয় বসু

BanglaBook.org

বোবারা

সময়টা শীতের একেবারে তুঙ্গে, তবু এরই মধ্যে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠা শহরের বুকে ফুটে উঠছে নতুন একটা আলো-ঝলমলে দিন। জেটির শেষে, সমুদ্র আর আকাশ গেছে এক দীপ্যমানতায় মিশে। ইভার অবিশ্যি এসব লক্ষ করছিল না, সে খুব ধীরে ধীরে বন্দরের গা ঘেঁষে বুলেভার্ড বরাবর সাইকেল চালিয়ে চলেছিল। তার অকেবো পা-টা অনড় প্যাডেলের ওপর স্থির। অন্যটা প্রাণপণে রাতের শিশিরভেজা ইটপাথর পেরোনোর জন্য লড়াই করে চলেছে। সীটের ওপর থুবড়ে পড়ে, মাথা না তুলে, সে চেষ্টা করে চলেছিল আদ্যিকালের ট্রামলাইনটার পাশ কাটাতে, হ্যান্ডেলের হ্যাঁচকা টানে একধারে সরে গিয়ে সে অন্য গাড়িঘোড়াকে পথ করে দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে কনুইয়ের ধাক্কায় ফেরনাঁদের দেওয়া লাঞ্চের থলেটাকে পিঠের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। থলের ভেতরকার খাবারটার কথা মনে করে তার বিদিকিচ্ছিরি লাগছিল দুটো পুরু গদাইমার্কা রুটির ফাঁকে, তার অতি প্রিয় স্প্যানিশ অমলেট বা তেলেভাজা বিফ্‌স্টিকের বদলে, এই এতটুকুন একটু চিজ।

কারখানার রাস্তা যে এত দীর্ঘ, আগে তো তা কখনো মনে হয়নি তার। তারও তবে বয়স হচ্ছে। চল্লিশেও যদিও সে এখনো আঙুরের চারার মতো খটখটে থেকে গেছে; মাংসপেশীগুলো আর আগের মতো চট করে গরম হয় না। মাঝেমধ্যে খেলার খবরে তিরিশ বছর বয়সী অ্যাথলেটদের যখন 'ভেটারেন' বলে, তার বড় অবাক লাগে। সে ফেরনাঁদকে বলত, 'আরে, এরাই যদি ভেটারেন হয়, তবে আমি তো হেদিয়ে গেছি।" তবু সাংবাদিকটি নেহাৎ ভুল বলেনি। তিরিশেই কখন যেন দমটা কমে আসে। চল্লিশেই কেউ হেদিয়ে না গেলেও তার জন্য আগে থেকেই তৈরি থাকতেই হবে। এজন্যই কি সে অনেকদিন হল শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে পিপের কারখানায় যাওয়ার রাস্তায় যেতে যেতে আর সমুদ্রটার দিকে চেয়ে দেখে না? কুড়ি বছর বয়সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আশ মিটত না তার, সমুদ্রবেলার একটা সপ্তাহান্তের আশায় সে হাপিত্যেশ করে বসে থাকত। খোঁড়া পা-টার জন্যই হোক বা না হোক, সমুদ্রে স্নান করতে কী চমৎকারই যে লাগত তার। তারপর দেখতে দেখতে দিন গেল কেটে। এল ফেরনাঁদ, জন্মাল তাদের ছেলে। ফলে বাঁচার তাগিদে শনিবার ওভারটাইম শুরু করতে হল পিপের কারখানায়। আর রোববার লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছোটখাটো টুকরোটাকরা কাজ। ধীরে ধীরে সে হারিয়ে ফেলল অশান্ত উত্তাল দিনগুলো, যা তাকে অসীম তৃপ্তি দিত। স্বচ্ছ ও গভীর জল, দুর্দান্ত রোদ, শরীরময়তা

BanglaBook.org

Les Muets

তার পক্ষে এর চেয়ে সুখের আর কিছুই ছিল না। অথচ এসবই যৌবনের সাথে সাথে অদৃশ্য হল। ইভার আজও সমুদ্রকে ভালবাসে। কিন্তু শুধু সন্ধেবেলাতেই, যখন উপসাগরের ঢেউগুলো আরো খানিকটা কালচে হয়ে যায়। বাড়ির ছাদের ওপর বসে সেই শান্ত নরম সময়টা সে খুশিমনে উপভোগ করে, পরনে ফেরনাঁদের চমৎকার ইস্তিরি করা জামা আর হাতে এক গেলাস ধোঁয়াটে আলিজেৎ। সন্ধ্যে নামে, আকাশের গায়ে ক্ষণস্থায়ী একটু কোমলতা, ইভারের প্রতিবেশীরা কথা বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে ফেলত। তখন সে বুঝতে পারত যে ঐ সময় শান্তভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, যদিও স্পষ্ট বুঝতে পারত না কীসের জন্য সেই অপেক্ষা।

সকালে কাজ শুরু করার সময় অবিশ্যি তার মোটেই সমুদ্রের দিকে তাকাতে ভাল লাগত না। যদিও সমুদ্র তার সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত। শুধু সন্ধ্যেবেলাতেই তাকে সে দেখতে চায়। সেদিন সকালে যখন সে মাথা নীচু করে সাইকেল চালাচ্ছিল, অন্যদিনের চেয়েও গম্ভীরভাবে। তার বুকের মধ্যেটা ছিল ভারাক্রান্ত। আগের দিন মিটিং-এর শেষে বাড়ি ফেরার পর যখন সে জানিয়ে ছিল আবার সে কাজে যোগ দেবে, ফেরনাঁদ খুশি হয়ে জিগ্যেস করেছিল, 'তার মানে মালিক তোমাদের মাইনে বাড়াচ্ছে বলো?' মালিক এক কানাকড়িও বাড়ায়নি, স্ট্রাইকটা মাঠে মারা গেছে। ব্যাপারটা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়নি, এটা স্বীকার করতেই হবে। রাতের হরতাল, একটু নরমসরমভাবে এগোনো ছাড়া ইউনিয়নের উপায়ও ছিল না। জনা পনেরো শ্রমিক, যেটা তেমন বেশি কিছু নয়। ইউনিয়ন অন্যান্য পিপের কারখানার অবস্থা খেয়াল রেখেছিল যেগুলো চলেনি। খুব দোষ দেওয়া যায় না। পিপের কারখানাগুলো জাহাজ আর তেলের গাড়ি তৈরির ধাক্কায় বেশ মার খাচ্ছিল। ছোট বড় সব পিপেই বানানো ক্রমশ কমে আসছিল, বরঞ্চ মেরামত করা হচ্ছিল বড় বড় তৈরি পিপে। এটা ঠিকই যে মালিকেরা টের পেয়ে গিয়েছিল ব্যবসায় সুবিধে হচ্ছে না। তবু কম মুনাফাতেই আপাতত চালিয়ে নিতে চেয়েছিল তারা। সবচেয়ে সহজ উপায় হল মাইনেতে রাশ টানা, তা সে জিনিষপত্রের দাম যতই বাড়ুকগে না কেন। পিপের কারখানাই যদি না থাকে, পিপেওলারা করবে কী? পেশাবদলানো তো মুখের কথা নয়, যখন এত কষ্ট করে কাজটা শিখতে হয়েছে। আর একাজটা মোটেও এলেবেলে নয়, শিখতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। সেরা পিপে মিস্ত্রী ধারের ঢালটাকে মানানসই করে বানাতে পারে, আগুনে ঝালাই করে লোহার চাকতিতে ঢুকিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ হাওয়া বের করে দিয়ে কোনরকম দড়িদড়ার সাহায্য ছাড়াই, যা রীতিমত বিরল ব্যাপার। ইভার একাজটা পারত আর তার জন্য তার অহঙ্কারও কম ছিল না। পেশাবদল অসম্ভব নয়। কিন্তু যে কাজটা জানা, যে কাজটার ওপর সম্পূর্ণ দখল, তেমন কাজ ছেড়ে দেওয়া মুখের কথা নয়। এমন চমৎকার একটা পেশা কিন্তু চাকরিবাকরি নেই, এতটাই কোণঠাসা হতে হচ্ছে যে কাজ না ছেড়ে গতি নেই। কিন্তু কাজ ছাড়াও কি সহজ কাজ? কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে, কোনো তর্কবিতর্ক আলাপ আলোচনা

BanglaBook.org

করা যাবে না। রোজ সকালে একই পথ মাড়িয়ে ফিরে আসা, ক্রমবর্ধমান ক্লান্তি নিয়ে সপ্তাহান্তে যা দেবে সেটুকু হাত পেতে নেওয়ার জন্য যাতে ক্রমশঃই আর পোষাবে না।

অতঃপর ওরা রাগে ফেটে পড়ল। দু'তিনজন একটু দোনোমোনো করেছিল, কিন্তু মালিকের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের পর তারাও গেল চটে। মালিক সোজা সাপটা জানিয়ে দিল ঃ হয় থাকো, নয়ত কেটে পড়ো। ভদ্দরলোকে এভাবে কথা বলে? 'কী ভেবেছে কি লোকটা, অ্যাঁ?' এসপোসিতো বলেছিল, 'যে আমাদের প্যান্ট খুলে দেব?' মালিক লোকটা কিন্তু এমনিতে খারাপ না। মালিকানাটা সে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, কারখানাতেই সে বড় হয়েছে আর দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত কারিগরকেই সে চেনে। মাঝেমাঝে সে কারখানাতেই তাদের খানাপিনাতে ডেকেছে। সার্ডিন-ভাজা অথবা কাঠের আগুনে বানানো পুডিং, একটু মদের সঙ্গে, আহ্। নববর্ষে সে প্রত্যেককে পাঁচ বোতল করে ভাল জাতের মদ উপহার দিয়েছিল, এবং প্রায়শই কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা কোনো ঘটনা ঘটলে; বিয়েসাদী উৎসব আমোদে উপহার দিত টাকাপয়সা। মেয়ে হওয়ার পর প্রত্যেককে মিষ্টি বিলোনো হয়েছিল। দু'তিনবার সে ইভারকে শিকার করতেও আমন্ত্রণ করেছে তার সমুদ্রসৈকতের বাড়িতে। নিঃসন্দেহে, তার কর্মচারীদের সে ভালই বাসত, এবং প্রায়শঃই বলত, তার বাবাও এখানে নবীশ হিসেবে ঢুকেছিলেন। কিন্তু সে একদিনের জন্যও তাদের কারুর বাড়ি যায়নি, যাওয়ার কথা ভাবেওনি। সে শুধু একমাত্র তারই কথা ভাবত, একমাত্র তাকেই চিনত, আর আজ বলে কিনা, 'হয় থাকো, নয় কেটে পড়ো।' অর্থাৎ সোজা কথা, সে নিজেই আজ হোঁচট খেয়েছে। অবিশ্যি তার সে অধিকার আছে।

শেষ পর্যন্ত, তারা ইউনিয়নকে বাধ্য করল কারখানা বন্ধ করে দিতে। 'স্ট্রাইক করে হেদিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। কারখানায় তালা পড়লে আমারই বরঞ্চ দু'পয়সা বাঁচবে।' কথাটা সত্যি নয়, তবে তাতে বিশেষ কিছু সুবিধে হয়নি, কারণ সে সোজাসুজি তাদের মুখের ওপর বলে দিয়েছিল যে স্রেফ করুণা করে সে তাদের রেখেছে। এসপোসিতো ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল লোকটা মানুষ নয়। অন্যজনও কম রগচটা নয় শেষে দুজনকে ছাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। তবে ইতিমধ্যে শ্রমিকেরাও একমত হয়ে গিয়েছিল। বিশ দিন ধরে হরতাল চলল, বাড়িতে মন-খারাপ বৌ, তাদের মধ্যে দু'তিনজন হতাশ, এবং শেষাশেষি ইউনিয়ন মাথা নোয়ানোর উপদেশ দিল, কোনো একটি রফার আশা জাগিয়ে, হরতালের দিনগুলো পুষিয়ে নেওয়ার জন্য ওভারটাইমের আশা দিয়ে। ওরা সবাই কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, অবিশ্যি খুব বীরত্ব দেখিয়ে, একথা বলতে বলতে যে কোনকিছুই ঠিক হয়নি, পুরো ব্যাপারটা আর একবার খতিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু আজ সকালে একটা পরাজয়ের ক্লান্তিভার তার ওপর চেপে বসেছে; মাংসের বদলে চিজ, এই বিভ্রম আর চলতে পারে না। সূর্য যতই জ্বলজ্বল করুক, সমুদ্রের ঢেউয়ে এতটুকু আশ্বাস

BanglaBook.org

নেই। ইভার তার একমাত্র প্যাডেলে চাপ দিল। তার মনে হচ্ছিল চাকার একেক চক্করের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আরো একটু বুড়িয়ে যাচ্ছে। কারখানার কথা, সহকর্মীদের কথা, মালিকের কথা, যাদের সঙ্গে একটু পরেই দেখা হতে চলেছে, ভাবতেই তার বুকটা আরো বেশি ভার হয়ে আসছে। ফেরনাঁদ চিন্তা করছিল 'কী বলবে তুমি ওঁকে?' 'কিছুই না', ইভার সাইকেলে চড়ে মাথা ঝাঁকিয়েছিল, আর দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছিল; তার ছোট বাদামি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাঁজপরা মুখ নামিয়ে দিয়েছিল ঝাঁপ। 'আমার কাজ কাজ করা, ব্যস্।' এখনো সে সাইকেল চালাচ্ছে, দাঁতগুলো এখনো চাপা, এক বিষণ্ণ ও শুকনো ক্রোধ আকাশটা পর্যন্ত অন্ধকার করে রেখেছে।

বুলেভার্ড ও সমুদ্র ছেড়ে ইভার এবার পুরোনো স্প্যানিশ চত্বরের স্যাঁৎস্যাঁতে রাস্তায় ঢুকল। রাস্তাটা খারিজ করা মালপত্তর, গাদা করা লোহালক্করের আর গ্যারেজের দিকে। সেখানেই তাদের কারখানা। সেটা আসলে একটা শেডের মতো, মাঝারি উচ্চতা অব্দি ইটের পাঁচিল, যেখান থেকে করুগেটেড চাল পর্যন্ত কাচ দিয়ে ঘেরা। এই কর্মশালাটি চলে গেছে প্রাচীন পিপের কারখানার দিকে—যেটা একটা উঠোন। তার চারপাশে ভেতরের পুরোনো উঠোন, যেটা ব্যবসা বাড়ার পর পরিত্যক্ত হয়েছে, যাতে আজকাল ব্যবহারজীর্ণ মেশিন আর পুরোনো পিপে ডাঁই করা থাকে। উঠোনটিকে আলাদা করে দিয়েছে পুরোনো টাইল-পাতা একটা রাস্তা গোছের। বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে তার বাড়ি। বিরাট ও কদাকার হলেও বাড়িটাকে দেখতে ভালই লাগে, নতুন আঙুর গাছ আর বাইরের সিঁড়ির দুপাশে তন্বী হানিসাক্‌ল ফুলের জন্য।

এক পলকে ইভার বুঝতে পারল কারখানার গেটগুলো বন্ধ। সামনে মজুরেরা জটলা করছে। ওদের কর্মজীবনের সর্বপ্রথম ওরা কাজে এসে দেখল গেট খোলা নেই। অর্থাৎ মালিক যা বলবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে। ইভার বাঁদিকে এগোল, সাইকেল রাখল শেডের ঢালু দিকটায়, তারপর গেটের দিকে এগোল। দূর থেকে এসপোসিতোকে চেনা যাচ্ছিল, বাদামিচুলো বড়সড় লোমশ লোক, তারই পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করত সে। নেতাসুলভ মুখওলা ইউনিয়নের প্রতিনিধি মার্কু, কারখানার একমাত্র আরবী কর্মী সৈয়দ, সবাই তার দিকে চেয়ে। সে তাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই, তারা হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল, কারণ গেটগুলো ভেতর থেকে খুলে গেছে। সুপারভাইজার বালস্তের এসে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। মজুরদের দিকে পেছন ফিরে, ধীরে ধীরে লোহার রেলের ওপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে সে ভারি গেটগুলোর একটি খুলে দিচ্ছিল।

বালস্তেরই ওদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড়। হরতাল সে চায়নি, কিন্তু যে মুহূর্তে এসপোসিতো বলেছিল যে সে মালিকের স্বার্থ দেখছে, সেই মুহূর্তে সে মুখে কুলুপ এঁটে ফেলেছিল। এখন সে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে, তার সেই চওড়া আর খাটো গাঢ় নীল সোয়েটার গায়ে, এর মধ্যেই খালি পা (সৈয়দকে বাদ দিলে মজুরদের মধ্যে একমাত্র সেই খালি পায়ে থাকে), তার স্বচ্ছ চোখ দিয়ে সবাইকে সে ঢুকতে দেখেছিল—এত

BanglaBook.org

স্বচ্ছ তার চোখ যে মনে হয় তার রোদে জ্বলা বুড়োটে মুখ, পুরু আর ঝুলে থাকা ঠোঁটের নীচে বিষণ্ণ ঠোঁটের ওপর তার চোখ দুটোতে কোনো রঙ নেই। ওরা কথা বলেনি। এই পরাজিত প্রত্যাবর্তনে ওদের মাথা মাটিতে নুয়ে পড়েছে। ওদের নিজেদের নীরবতায় ওরা ক্রুদ্ধ, সেই নীরবতা যত দীর্ঘ হচ্ছে, ওদের পক্ষে তা ভাঙা ততই শক্ত হচ্ছে। ওরা বালস্তেরের দিকে দৃকপাত না করে ভেতরে ঢুকছিল, কারণ ওরা ভালই জানত বালস্তের ওদের এভাবে ঢুকিয়ে শুধু আদেশ পালন করছে; তাছাড়া তার তিক্ত বিষণ্ণ চেহারা দেখে টের পাওয়া যাচ্ছিল সে কী ভাবছে'। ইভার সেদিকে তাকিয়ে ছিল। বালস্তের তাকে ভালবাসত, সে কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ল।

ওরা সকলেই এখন পোশাক বদলানোর জায়গায়। অর্থাৎ গেটের ডানদিকে। খোলা খুপরির মাঝে শাদা কাঠের তাক, যার প্রত্যেক দিকে একটা করে আলমারি, সেগুলোকে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করা যায়। প্রবেশপথ থেকে দূরে শেষ খুপরিটা—যেটা শেডের দেয়ালে গিয়ে মিশেছে—রয়েছে একটি পাওয়ারের ব্যবস্থা। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে একটি নর্দমাও বানানো হয়েছে। শেডের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা তৈরি হওয়া পিপে। কিছু আলগাভাবে বৃত্তায়িত, ঝালাইয়ের অপেক্ষায়। কয়েকটা পুরু বেঞ্চি লম্বা গর্ত করা (যেগুলির কয়েকটি নীচে কাঠের গোলাকার তলা র‍্যাঁদা দিয়ে এখনো ছেঁচা না হলেও ভেতরে গলিয়ে দেওয়া হয়েছে), শেষে কালচে হয়ে ওঠা আগুন। দেয়াল বরাবর বাঁদিক থেকে গেট অব্দি সারি দিয়ে বেঞ্চি পাতা। সামনে কাঠের স্তূপ, র‍্যাঁদা দিয়ে মসৃণ করার অপেক্ষায়। ডানদিকে দেয়ালের গায়ে পোশাক বদলানোর জায়গা থেকে বেশি দূরে নয়। দুটো বিরাট বৈদ্যুতিক করাত, আচ্ছা করে তেল মাখানো, শক্তিধর ও নিঃশব্দ, ঝলসে উঠছে।

অনেকদিন হল, শেডটা গুটিকয়েক মানুষের পক্ষে একটু যেন বেশি বড় লাগছিল। প্রচণ্ড গরমের সময় সেটা যেমন সুবিধের, শীতকালে আবার তেমনি অসুবিধেজনক। কিন্তু আজ ঐ বিরাট জায়গায় কাজ থেমে আছে, নষ্ট হওয়া পিপে কোণে ডাঁই করা। কোথাও পিপে তৈরির ওপরের কাঠের দিকটা প্রস্ফুটিত, কাঠের বিশ্রী ফুলের মতো, করাত-গুঁড়োর তক্তাগুলো, যন্ত্রপাতি আর মেশিনগুলো ছেয়ে গেছে। সবকিছু মিলে একটা পরিত্যক্ত গা-ছাড়া ভাব। এতক্ষণে পুরোনো সোয়েটার আর রঙচটা তাপ্পিমারা প্যান্ট গায়ে চড়িয়ে ওরা এসব চেয়ে দেখে, আর দোনোমোনো করতে থাকে। বালস্তের ওদের ওপর লক্ষ রাখছিল। 'বেশ, তাহলে শুরু করা যাক?' জিজ্ঞেস করেছিল সে। এক এক করে ওরা একটি কথাও না বলে, সকলে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। বালস্তের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বলে এলো কোথায় কাজ শুরু ও শেষ করতে হবে। একজনও উত্তর দেয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতুড়ির প্রথম ঘা ঝন্‌ঝন্ করে উঠল লোহালাগানো কাঠের চাকতির ওপর, পিপের খোলা অংশে সেটাকে সেঁধিয়ে দেওয়ার জন্যে। কাঠের গাঁটের ওপর র‍্যাঁদার আওয়াজ শুরু হল, আর এসপোসিতোর চালানো

BanglaBook.org

একটা বাঁকা-দাঁত করাত প্রচণ্ড শব্দ করে চলতে শুরু করল। নির্দেশ অনুযায়ী, সৈয়দ আনছিল পিপের কাঠ, আগুনের ওপর পিপে রাখা হচ্ছিল লোহার ব্লেডের চাকতির উপযোগী করে সেটাকে ফোলানোর জন্য। যখন তার কাছে কেউ কিছু চাইছে না, সে তক্তার ওপর মরচে-পড়া বড় বড় চাকতিগুলো হাতুড়ির ঘা মেরে বসিয়ে দিচ্ছিল। পোড়া কাঠের গুঁড়োর গন্ধ আবার কারখানাটাকে ভরিয়ে দিতে শুরু করল। র‍্যাঁদা চালাতে চালাতে আর এসপোসিতোর কাটা কাঠের খণ্ডগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে সেই পুরোনো গন্ধটা ইভারের নাকে এল। আর বুকের ভেতরটাও একটু হাল্কা হল। সকলে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছিল, আস্তে আস্তে একটা উষ্ণতা, একটা সজীবতা ফিরে এল কারখানায়। বিরাট কাচের জানালাগুলো দিয়ে তাজা রোদ শেডটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সোনালি বাতাসে নীলাভ ধোঁয়া। এমনকী ইভার শুনতে পাচ্ছিল একটা পোকা ওর চারপাশে গুনগুন করছে।

এমন সময়, কারখানার ভেতরের দিকে দেয়ালের দরজাটা খুলে গেল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মালিক ম্যসিয় লাসাল। রোগাটে শ্যামবর্ণ, বয়স তিরিশ পেরিয়েছে কি পেরোয়নি। বেজ-রঙের গ্যাবারডিনের সুটের নীচে বুক-খোলা শাদা জামা। তাকে বেশ সহজ দেখাচ্ছিল। খুর দিয়ে চাঁছা, হদ্দ হাড়গিলে মুখ সত্ত্বেও, সাধারণত তাকে দেখতে ভালই লাগে। খেলোয়াড়দের যেমন সাবলীল ভাবভঙ্গি হয়, সেইরকম। তবুও চৌকাঠ পেরোনোর সময় তাকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল। সে যখন 'সুপ্রভাত' কথাটা উচ্চারণ করল, তা যেন অন্যদিনের চেয়ে কমজোর শোনাল। যাইহোক, কেউ উত্তর দেয়নি। হাতুড়ির শব্দ একটু থমকে গেল যেন, সুর কেটে গেল, তারপর আবার নতুন করে শুরু হল। লাসাল দ্বিধাগ্রস্তভাবে কয়েক পা এগোল, তারপর এগিয়ে গেল নাটা ভালেরির দিকে, যে মাত্র বছরখানেক হল কাজে যোগ দিয়েছে। ইভারের যান্ত্রিক করাতের পুরো একটা পিপের তলা লাগাচ্ছিল সে, মালিক সেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কোনো কথা না বলে ভালেরি কাজ করে যাচ্ছিল। 'তারপর?' লাসাল বলল, 'সব ঠিকঠাক তো?' ছোকরাটিকে তখন খুব আনাড়ির মতো দেখাল। সে একবার এসপোসিতোর দিকে তাকাল, যে তার পাশে বিরাট বিরাট হাত দিয়ে কাঠের টুকরো জোগাড় করছিল ইভারকে দেওয়ার জন্য। কাজ করতে করতে এসপোসিতোও তার দিকে তাকাল, এবং ভালেরিও তার পিপের দিকে মন দিল, মালিকের কথায় সাড়া না দিয়ে। লাসাল একটু চমকেছিল, দু-এক মুহূর্তে সে ছোকরাটির সামনে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে মার্কুর দিকে ফিরল। কাঠের তক্তার ওপর দুধারে পা ছড়িয়ে বসে, ধীরে ধীরে, নিখুঁতভাবে পিপের তলার কাঠটার ধারগুলো চাঁছছিল। 'কী খবর মার্ক', লাসাল শুকনো গলায় জিগ্যেস করল। মার্কু উত্তর দিল না, খুব মন দিয়ে সে খেয়াল করছিল খুব সূক্ষ্ম কাঠের টুকরো ছাড়া কোনো বড় চাঙ্ না ছেড়ে বেরিয়ে আসে। 'তোমাদের হয়েছেটা কী?' লাসাল এবার অন্য কর্মচারীদের দিকে ঘুরে গিয়ে জোর গলায় প্রশ্ন করল। 'মতে মেলেনি, সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে একসাথে

BanglaBook.org

কাজ করা যাবে না কেন? আর এসব করে লাভই বা কী?' মার্কু উঠে দাঁড়াল, তলার চাকতিটা খুলে নিল। বৃত্তটা ঠিক হয়েছে কিনা তালু দিয়ে দেখল, তার আয়েসী চোখদুটো গভীর তৃপ্তিতে একবার কুঁচকালো, তারপর নিঃশব্দে আরেকজন কর্মচারীর দিকে এগোল যে পিপের অংশ জড়ো করছে। গোটা কারখানায় এখন শুধু হাতুড়ি আর ধাতব করাতের শব্দ। 'বেশ', লাসাল বলল, 'সব ঠিক হয়ে গেলে বালস্তেরকে জানিও।' বলে শান্ত পায়ে সে কারখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কারখানার আওয়াজ ভেদ করে দুদুবার ঘণ্টি বেজে উঠল। বালস্তের সবেমাত্র একটা সিগারেট পাকাতে বসেছিল, সে ভারি পায়ে উঠে ভেতরের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। বালস্তের বেরিয়ে যাওয়ামাত্রই হাতুড়ি পেটানোর গতি কমল। একজন তো সে ফিরে আসার পর একেবারেই থেমে গেল। বালস্তের দরজা থেকে বলল, 'মার্কু আর ইভার বাবু তোমাদের ডাকছে।' শুনে ইভার প্রথমেই হাত ধুতে যাচ্ছিল। মার্কু এসে মাঝপথে ওর হাত ধরল। ইভার খোঁড়াতে খোঁড়াতে মার্কুর পেছনে পেছনে রওনা হল।

বাইরের উঠোনে রোদ্দুর এত তাজা, এত তরল যে ইভার মুখে ও নগ্ন বাহুতে সেটাকে অনুভব করতে পারছিল। বাইরের সিঁড়িটা দিয়ে তারা ওপরে উঠল—হানিসাক্‌লের নীচ দিয়ে —যাতে ইতিমধ্যেই কয়েকটা ফুল ফুটেছে। যখন তারা ডিগ্রী-ডিপ্লোমাভরা করিডোরটায় ঢুকল, তাদের কানে এল একটা বাচ্চার কান্না, আর ম্যসিয় লাসালের গলা ঃ 'খাওয়ার পরেই ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। না কমলে ডাক্তার ডাকতে হবে।' তারপর সে করিডোরে বেরিয়ে এল ও তাদের সেই ছোট্ট অফিসঘরে নিয়ে গেল যা তাদের বহুদিনের চেনা। গ্রামীণ ফার্নিচারে ভরা, দেয়ালভর্তি খেলাধূলার ট্রফি, 'বোসো', ডেস্কের পেছনে তার চেয়ারে বসে, সে বলল। ওরা দাঁড়িয়েই রইল। 'আমি তোমাদের ডেকে পাঠালাম কারণ, মার্কু, তুমি ওদের প্রতিনিধি, আর ইভার, তুমি বালস্তেরের পর আমাদের সবচেয়ে পুরোনো লোক। যে-আলোচনা শেষ হয়ে গেছে তা আমি নতুন করে শুরু করতে চাই না। তোমরা যা চাইছ, তা আমি দিতে পারছি না। ব্যাপারটা মিটে গেছে, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে নতুন করে কাজ শুরু করা দরকার। আমি বুঝতে পারছি তোমরা আমার ওপর চটে আছ, সেটা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক। আমার যা মনে হল তাই বললাম। আমি যেটা যোগ করতে চাই সেটা হল ঃ আজ আমি যেটা পারছি না ভবিষ্যতে অবস্থা ভাল হলে হয়ত পারব। আর পারলে তোমরা চাওয়ার আগেই আমি সেটা দোব। সেদিনের অপেক্ষায় এসো না এবার আমরা একযোগে কাজ করি!' এটুকু বলে সে থামল, কিছু একটা ভাবল, তারপর চোখ তুলে ওদের চোখে চোখ রেখে বলল, 'ঠিক তো?' মার্কু বাইরের দিকে দেখছিল। দাঁতে দাঁত পিষে ইভার কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু পারছিল না। 'শোনো', লাসাল বলল, 'তোমরা যথেষ্ট মাথা গরম করেছ। ওটা ঠিক হয়ে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা হলে ভেবে দেখো আমি কী বললাম।' সে উঠে দাঁড়িয়ে মার্কুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত

BanglaBook.org

বাড়িয়ে দিল। বলল, 'আবার দেখা হবে।' মার্কুর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। পরমুহূর্তে তার সুন্দর মুখখানি শক্ত হল ও এক নিমেষের মধ্যে ভয়ঙ্কর। সে দ্রুতবেগে পিছু ফিরে বেরিয়ে গেল। লাসাল ফ্যাকাশে মেরে গেছিল, সে ইভারের দিকে তাকাল কিন্তু হাত বাড়াল না। 'যাও, জাহান্নামে যাও।' সে খেঁকিয়ে উঠল।

ওরা যখন কারখানায় ফিরে এল, ততক্ষণে মজুরেরা লাঞ্চ খাচ্ছে। বালস্তের নেই। মার্কু শুধু বলল, 'ফালতু'। বলে নিজের কাজের জায়গায় ফিরে গেল। এসপোসিতো রুটি চিবোনো থামিয়ে জিজ্ঞেস করল সে কী উত্তর দিয়েছে। ইভার জানাল তারা কোনো উত্তরই দেয়নি। বলে সে লাঞ্চের থলে খুঁজতে গেল এবং ফিরে এসে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। সে খেতে যাচ্ছিল যখন দেখতে পেল সৈয়দ কাঠের গুঁড়োর ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে কাচের জানলার দিকে, যা ম্লান হয়ে আসা আকাশের রঙে নীলাভ দেখাচ্ছে। ইভার জিজ্ঞেস করল তার খাওয়া হয়ে গেছে কিনা। সৈয়দ উত্তর দিল, সে কিছু খায়নি। ইভার আর খেতে পারল না। লাসালের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে যে কষ্ট সে টের পাচ্ছিল, তার বদলে এখন সে অনুভব করছে একটা চমৎকার উষ্ণতা। সে উঠে দাঁড়িয়ে রুটিটা ভেঙে ফেলে সৈয়দের প্রত্যাখ্যানের জবাবে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমিই আবার পরে একদিন আমায় দেবে।' সৈয়দ হাসল, ইভারের স্যান্ডউইচের টুকরোটা চিবোতে চিবোতে, খুব হাল্কাভাবে, যেন মানুষটার খিদে নেই।

এসপোসিতো একটা সস্‌প্যান নিয়ে কাঠের গুঁড়োর আগুন জ্বালাল। বোতলে করে আনা কফি গরম করতে লাগল সে। সে জানাল তার দোকানদার তাদের স্ট্রাইক ব্যর্থ হওয়ায় ওটা উপহার দিয়েছে। একটা ছোট্ট গেলাস সবার হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, প্রত্যেক বারই এসপোসিতো চিনি দেওয়া কফি ঢেলে দিচ্ছিল। খাওয়ার সময় সৈয়দ যে আনন্দ পায়নি কফি খেয়ে সে তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ পেল, মনে হচ্ছিল। জ্বলন্ত সস্‌প্যান থেকে ঠোঁটের চকামচকাম শব্দ করে আর খিস্তি দিতে দিতে এসপোসিতো বাকী কফিটুকু খেল। ঠিক এই সময় বালস্তের ঢুকল কাজ শুরু করার নির্দেশ দিতে।

তারা যখন উঠে পড়ে কাগজ আর বাসন ব্যাগে পুরছে বালস্তের তাদের মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল, এবং হঠাৎ বলল, ঘটনাটা ওদের সকলের পক্ষেই যন্ত্রণাময়, তার নিজের পক্ষেও, কিন্তু তাই বলে শিশুর মতো আচরণ করলে তো চলবে না, ক্ষোভ দেখিয়ে তো কোনো লাভ নেই। এসপোসিতো সস্‌প্যান হাতে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল; তার মোটা লম্বাটে মুখটা মুহূর্তে লাল হয়ে উঠেছে। ইভার জানত সে কী বলবে, যে সকলেই তার মতো করে ভাবছে, তাদের ক্ষোভ নয়, তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, হয় কাজ কর, নয় কেটে পড়ো। রাগ আর অক্ষমতা মাঝে মাঝে এত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে যে কাঁদতেও পারা যায় না। তারা তো মানুষ, ব্যস্‌ এ অবস্থায় হাসি আর মুখভঙ্গি তো ওদের দ্বারা সম্ভব হবে না। কিন্তু এসপোসিতো সেসব কিছুই বলল না, শেষ

BanglaBook.org

পর্যন্ত তাদের মুখ নরম হল, এবং সে আস্তে করে বালস্তেরের কাঁধে চাপড় মারল, আর অন্য সবাই ফিরে গেল কাজে। আবার ঝনঝন করে উঠল হাতুড়ি, বিরাট শেডটা পরিচিত আওয়াজে গেল ভরে, কাঠের গুঁড়ো আর ঘর্মাক্ত জামাকাপড়ের গন্ধে। বড় করাতটা গুঞ্জন করে কামড়াতে লাগল নতুন কাঠ, যা এসপোসিতা আস্তে আস্তে সেদিকে ঠেলে দিচ্ছিল। কামড়ের জায়গাটা থেকে এক ধরণের ভেজা গুঁড়ো বেরিয়ে আসছিল, পাঁউরুটির গুঁড়োর মতো, যেটা সে তার মোটা লোমশ হাতে তুলে নিচ্ছিল, কাঠের ওপর শক্তভাবে হাত রেখে, গর্জন করা ব্লেডের দু'পাশ থেকে। কাঠটা চাঁছা হয়ে যাওয়ার পর, মোটরের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

র‍্যাঁদা ওপর ঝুঁকে পড়ে ইভার তার পিঠের ব্যথাটা টের পাচ্ছিল। সাধারণত ক্লান্তি আসত আরো পরে। বোঝাই যাচ্ছে, কসপ্তাহ কাজ না করে অভ্যেসটা চলে গেছে। সে সেই বয়সের কথা ভাবছিল যখন হাতের কাজ কঠিন মনে হয়, সূক্ষ্মতা থাকে না। ব্যথাটা টের পাইয়ে দিচ্ছিল তার বার্ধক্য। যখন বেশী কাজ করে না, কাজের দুর্নাম হয়, তারপর আসে মৃত্যু। ঐ পরিশ্রমের সন্ধ্যেগুলো, ঘুম, সবকিছুই মৃত্যুর মতন যে। ছেলেটা মাষ্টার হতে চায়, ও ঠিকই ভেবেছে, যারা মজুরির ওপরে গরম বক্তৃতা দেয় তারা জানে না জিনিসটা কী?

যখন ইভার নিজেকে সামলে নিয়ে দম নিল আর খারাপ জিনিসগুলো মন থেকে তাড়াল। ততক্ষণে আবার ঘণ্টা বেজে উঠেছে। এত অদ্ভুতভাবে সেটা বাজছে, মাঝেমাঝে থেমে থেমে আবার জোর দিয়ে নতুন করে। বালস্তের শুনছিল, অবাক হয়ে, তারপর মনঃস্থির করে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোল। সে বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত পর ঘণ্টাটা শেষ পর্যন্ত থামল। আবার প্রচণ্ড বেগে দরজাটা খুলে গেল, আর বালস্তের ছুটল পোশাকের ঘরের দিকটায়। সে বেরোল, দড়ির স্যান্ডেল পায়ে, জ্যাকেট পরতে পরতে; যেতে যেতে সে ইভারকে বলল : 'বাচ্চা মেয়েটার প্রচণ্ড অসুখ, আমি চললাম জেরম্যাঁর খোঁজে।' বলেই সে বড় গেটের দিকে দৌড়ল। কারখানার ডাক্তার জেরম্যাঁ থাকে মফঃস্বলের শহরে। কোনো মন্তব্য ছাড়াই, ইভার সবাইকে জানাল কথাটা। সকলে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, খুব বিব্রতভাবে। শোনা যাচ্ছে শুধু যান্ত্রিক করাতের ঘড়ঘড় শব্দ, যা একা একাই ঘুরে চলেছে। হয়ত তেমন কিছু না।' কেউ একজন বলল। তারা নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেল, কারখানা আবার আওয়াজে ভরে গেছে। কিন্তু ওরা কাজ করছে খুব ধীরে ধীরে, যেন ওরা কোনোকিছুর প্রতীক্ষায়।

সোয়া ঘণ্টাটাক পরে বালস্তের আবার ঢুকল, জ্যাকেট পড়ল, তারপর একটা কথাও না বলে ছোট দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। কাচের গায়ে তখন কোমল হয়ে আসছে আলো। একটু পরে বিরতির সময় যখন করাত আর কামড়াচ্ছে না কাঠ, সবাই শুনল অ্যাম্বুলেন্সের একটানা আওয়াজ, প্রথমে দূরে, পরে কাছে, এবং তারপরে সব চুপ। একটু পরে শোওয়ার ঘরে জামাকাপড় খোলার সময় হঠাৎ বাচ্চাটা দড়াম করে পড়ে

BanglaBook.org

যায়, যেন কেউ ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। 'বলো কি!' মার্কু বলল। বালস্তের মাথা নেড়ে অস্পষ্ট একটা ভঙ্গি করল কারখানার দিকে ফিরে, কিন্তু তাকে বেশ বিপর্যস্ত লাগছিল। আবার শোনা গেল অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ। কারখানায় ওরা সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, কাচে প্রতিসরণ হওয়া হলদে আলোর ঢেউয়ের মধ্যে। তাদের রুক্ষ্ম হাতগুলো করাতের গুঁড়ো-ভরা পাৎলুনের দু'ধারে নিষ্প্রয়োজনভাবে ঝুলছিল।

বাকি বিকেলটা কোনক্রমে টেনে হিঁচড়ে কাটল। সেই অসীম ক্লান্তিটা ইভার আর অনুভব করছিল না, কিন্তু বুকের উৎকণ্ঠাটা যায়নি। অন্যরাও না। তাদের কথা বলতে অনিচ্ছুক মুখের ওপর শুধু পড়া যাচ্ছিল বেদনা ও একধরনের একগুঁয়েমি। মাঝে মাঝে তার মনে দুঃখ কথাটা দানা বেঁধে উঠছিল কোনক্রমে, কিন্তু তারপর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছিল জন্মেই ফেটে যাওয়া একটা বুদ্বুদের মতো। তার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল, ফেরনাঁদকে দেখতে ইচ্ছে করছিল, বাচ্চাটাকে, ছাদটাকে। ঠিক এই সময়, বালস্তের এসে ঘোষণা করল যে কারখানা বন্ধ। যন্ত্রগুলো গেল থেমে। ধীরে ধীরে তারা আগুন নেভাতে শুরু করল। তারপর একে একে দাঁড়াল পোশাক বদলানোর জন্য। সৈয়দ ছিল সকলের শেষে, তার পুরো কাজের জায়গাটা পরিষ্কার করার কথা। ধুলোর ওপর জল ছড়ানোর কথা। ইভার যখন পোশাক বদলানোর জায়গায় পৌঁছল, বিরাট ও লোমশ এসপোসিতো তখন ধারাস্নান করছে। তাদের দিকে পেছন ফিরে সে সশব্দে সাবান মাখছিল। সাধারণত ওর লজ্জা নিয়ে সবাই ঠাট্টা করত। ঐ বিরাট ভালুকটা গোঁয়ারের মতো তার শরীরের মহৎ অংশগুলো লুকিয়ে রাখত। নেংটির মতো করে একটি তোয়ালে জড়িয়ে এসপোসিতো পিছু হটে বেরোল। অন্যেরাও একে একে গেল আর মার্কু খুব জোরে জোরে ন্যাংটো কোমর বাজাতে লাগল যখন বড় গেটটি আস্তে আস্তে লোহার চাকার ওপর দিয়ে খুলে গেল। লাসাল ঢুকল।

প্রথম বারের মতোই তার পোশাক, শুধু চুলগুলো একটু এলোমেলো। সে চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল, পরিত্যক্ত কারখানার দিকে দেখল, কয়েক পা এগোল, পোশাকখানার দিকে তাকাল। এসপোসিতো তখনো সেই নেংটি পরে আছে, সে তার দিকে ফিরল। উলঙ্গ, বিব্রত, সে এক পা থেকে অন্য পায়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছিল। ইভারের মনে হল মার্কুর কিছু বলা উচিত। কিন্তু চারপাশে ঝরে পড়া বৃষ্টিধারার ভেতর সে অদৃশ্য হয়েই থাকল। এসপোসিতো কোনমতে একটা জামা জড়িয়ে নিচ্ছিল যখন লাসাল প্রায় নীচ গলায় বলল : 'শুভসন্ধ্যা'; বলে গেটের দিকে এগোল। ইভারের যতক্ষণে মনে হল ওকে ডাকা উচিত, ততক্ষণে গেট বন্ধ হয়ে গেছে।

হাত পা না ধুয়েই ইভার জামাকাপড় চড়িয়ে নিল, সেও 'শুভসন্ধ্যা' বলল, কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে, এবং সকলেই সমান উষ্ণতায় সেকথায় উত্তর দিল। সে দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়ে সাইকেলটা খুঁজল, এবং সেটাতে চড়েই টের পেল সেই ব্যথাটা। পড়ন্ত

BanglaBook.org

বিকেলে সে ভিড়ভাট্টা পেরিয়ে চলেছিল। তার আদ্যিকালের বাড়ি আর ছাদটাকে সে তাড়াতাড়ি ফিরে পেতে থাকুক সে বাথরুমে গিয়ে পা ধোবে, তারপর বসবে। আর সমুদ্রের পানে চেয়ে থাকবে, যে সমুদ্র ইতিমধ্যেই তার সঙ্গী, যে সমুদ্র সকলের চেয়ে গাঢ় নীল, বুলেভার্ডের চালের ওপারে যাকে দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট মেয়েটাও ওর পিছু নিয়েছে, ওর কথা খালি মনে পড়ছে।

বাড়িতে পৌঁছে দেখল ছেলেটা ইতিমধ্যেই ইস্কুল থেকে ফিরে ছবির বই পড়ছে। ফেরনাঁদ ইভারকে শুধোল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। সে একটিও কথা বলেনি, স্নানঘরে গা ধুয়ে বেঞ্চিতে বসেছিল ছাদের ছোট্ট পাঁচিলটার সামনে। তার মাথার ওপর সেলাই করা জামাকাপড় ঝুলছিল; আকাশ হয়ে উঠেছিল স্বচ্ছ। পাঁচিলের ওপারে সন্ধ্যেবেলার শান্ত সমুদ্র। ফেরনাঁদ ফিরে এল আলিজেৎ হাতে নিয়ে, সঙ্গে দুটো গেলাস আর এক ঘটি জল। সে তার স্বামীর পাশে গিয়ে বসল। ইভার তার হাতে হাত রেখে সব কথা বলল, বিয়ের প্রথম দিনগুলোর মতো। বলা শেষ করে সে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকল, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে যেখানে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ইতিমধ্যেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে গোধূলি। 'আহ্! ওটা ওরই দোষ।' সে বলল। তার মনে হচ্ছিল তার বয়স কম হলে, ফেরনাঁদেরও, তারা দুজনে সমুদ্দুরটার ওপারে চলে যেত।

ফরাসী থেকে ভাষান্তর : চিন্ময় গুহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অভ্যাগত

স্কুলমাস্টার দেখলেন দুজন তাঁর দিকে উঠে আসছে। একজন ঘোড়ায় চড়ে, অন্যজন পায়ে হেঁটে। পাহাড়ের ধারে তৈরী স্কুলটাতে ওঠার খাড়াই পথটা তারা তখনও ধরেনি। বন্ধ্যা, নিষ্প্রাণ, ধূ-ধূ প্রান্তরের এই মালভূমির পাথুরে পথে জমে থাকা বরফে তারা খুব কষ্ট করেই এগোচ্ছিল। কখনো সখনো ঘোড়াটা হোঁচট খাচ্ছিল। তার সাড়াশব্দ পাওয়া না গেলেও, নাকের থেকে নির্গত বাষ্প দেখা যাচ্ছিল। দুজনের একজন অন্ততঃ এ তল্লাটটা চিনত। কয়েকদিনের বাসী, নোংরা সাদা চিলতে তুষারপাত ঢেকে যাওয়া পথটাকে অনুসরণ করছিল তারা। মাস্টার হিসেব করলেন যে তাদের পাহাড়ে উঠতে এখনও আধঘণ্টাটাক লাগবে। বেশ শীত; একটা সোয়েটার খুঁজতে তিনি স্কুলের ভেতরে গেলেন।

খালি, শীতল ক্লাসরুম পেরিয়ে গেলেন। ব্ল্যাকবোর্ডে চাররঙে আঁকা ফ্রান্সের চারটি নদী গত তিনদিন ধরে তাদের মোহনার দিকে ধেয়ে চলেছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি প্রচুর বরফ পড়েছিল। আটমাস খরার পর, অনাবৃষ্টিও কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। মালভূমির ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা গ্রামগুলোর গোটা বিশেক ছাত্রও আসা বন্ধ করেছে। তারা ঝক্‌ঝকে দিনের অপেক্ষায়। দারু ক্লাশরুমের পাশে তার থাকার ঘরটিকে শুধু গরম করলেন। ঘরটির পূবদিকে খোলা বিস্তীর্ণ মালভূমি। ক্লাশরুমগুলোর মতই তার ঘরের জানলাও দক্ষিণমুখো। ওইদিকটায়, যেখানে মালভূমি দক্ষিণদিকে ঢালু হয়েছে, সেইদিক থেকে স্কুলটা কয়েক কিলোমিটার দূরে। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে রক্তবর্ণ পাহাড়চূড়া দেখা যায়, সেখানেই মরুভূমির প্রবেশদ্বার।

সামান্য গরম বোধ করায়, দারু প্রথমবার যে জানালা থেকে লোকদুটিকে দেখেছিলেন সেখানে ফিরে গেলেন। এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছিল না। তাহলে তারা চড়াই পথে। আকাশ হালকা কাল। রাত্রের বরফপড়া বন্ধ হয়েছে। সকালের শুরুটা হয়েছিল ঘোলাটে আলোয়। পরে মেঘের আস্তরণ পুরু হয়ে উঠলেও আলোর কমবেশি হল না। বেলা দুটোর সময়েও আপনি বলবেন যে দিন সবে শুরু হল। তবু তা সত্ত্বেও গত তিনদিনের একটানা আঁধারে পুরু তুষারপাতের থেকে তা অনেক ভাল, তার সঙ্গে ছিল আবার ক্লাশরুমের ডাবলডোর কাঁপান প্রবল ঝড়ের দাপল। সে সময় দারু তার ঘরেই দীর্ঘক্ষণ কাটিয়েছেন; বেরিয়েছেন শুধু মুরগীগুলোর দেখভাল করতে আর কয়লা জোটানোর খাতিরে—তাও চালাঘরের ছাদ পর্যন্ত। কি ভাগ্যি যে উত্তরের একদম কাছের গাঁ তাজিদ থেকে টেম্পো তুষারঝড়ের দু'দিন আগেই জিনিষপত্র দিয়ে গেছিল। সেটা আবার দু'দিনের মধ্যে ফিরবে।

L'Hote

BanglaBook.org

অবরোধ প্রতিহত করার মত তাঁর অনেক কিছুই ছিল, ছোট্ট ঘরটা ভর্তি বস্তা বস্তা আটা, প্রশাসনের তরফে এগুলো তাঁকে দেওয়া হয়েছিল খরায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ছাত্রদের মধ্যে বন্টন করার জন্য। আসলে যেহেতু তারা প্রত্যেকেই হতদরিদ্র তাই চরম দুর্দশা তাদের ওপর নেমে এসেছে। প্রতিদিন, দারু ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে তা বিলি করতেন। তাঁর জানা ছিল যে দুর্দশার দিনে কেউ এর ভাগ পায়নি। হয়তো আজ সন্ধ্যেতেই কারোর বাবা অথবা দাদা এসে পড়বে আর তখন তাঁকে কিছু না কিছু তুলে দিতেই হবে। আগামী মরশুম পর্যন্ত যে করেই হোক ওদের চালিয়ে নিয়ে যেতেই হবে, ফ্রান্স থেকে জাহাজ ভর্তি গম আসছে, দুরবস্থাও প্রায় শেষ। কিন্তু এই দুর্দশা বিস্মৃত হওয়াও খুব সহজ নয়। সূর্যালোকে শতচ্ছিন্ন প্রেতের মিছিল মাসের পর মাস সূর্যদগ্ধ উপত্যকা, ক্রমশ ঝলসে যাওয়া চরাচর, প্রায় পুড়ে যাওয়া, পদতলে পিষ্ট হয়ে প্রত্যেক পাথরখণ্ড গুঁড়িয়ে যাওয়া। হাজারে হাজারে ভেড়ার মৃত্যু, এখানে-ওখানে দু-চারজন অজানা মানুষেরও।

এই দুর্দশার মধ্যেই প্রত্যন্ত স্কুলে প্রায় সন্ন্যাসীর মত মত বসবাসকারী এই লোকটি অল্পে এবং সাধারণ জীবনে সন্তুষ্ট থেকে প্রভুর মতই জীবনযাপন করতেন, নিজের এবড়ো খেবড়ো দেয়াল, সংকীর্ণ বিছানা, সাদা তাক, সাপ্তাহিক জল ও আহার্যের পরিমাণ নিয়ে। আর তারপরই হঠাৎ কোন সতর্কীকরণ ছাড়াই, বৃষ্টির কোন বালাই না রেখেই এই তুষারঝঞ্ঝা। এই তল্লাটটা এরকমই, বেঁচে থাকাই নিষ্ঠুরতা, এমনকি মানুষদের ছাড়াই; তারা খুব কাজে আসে না। কিন্তু দারু এখানেই জন্মেছেন। অন্যত্র তাঁর নির্বাসিত মনে হত।

বাইরে এসে তিনি স্কুলের সামনের প্রাঙ্গণে হেঁটে এলেন, লোকদুটি তখন খাড়াই পথের মাঝামাঝি। ঘোড়ার পিঠের লোকটিকে তিনি চিনলেন, বালদুচ্চি। বহুদিনের পরিচিত বৃদ্ধ সেপাই। বালদুচ্চির হাতে ধরা দড়ির একপ্রান্তে বাঁধা নতমস্তক একজন আরব। সেপাইটি তাকে হাত নাড়াল কিন্তু দারু কোন প্রত্যুত্তর জানালেন না, কারণ তিনি অন্যমনস্ক হয়ে মাথাঢাকা শেজ টুপি, পায়ে স্যান্ডাল কিন্তু মোটা সস্তা উলের মোজায় ঢাকা, নীলচে জোব্বা পরিহিত আরবটিকে লক্ষ্য করছিলেন। তারা এগিয়ে এল। বালদুচ্চি তার ঘোড়াটিকে সুস্থ হাঁটিয়ে আনছিল যাতে আরবীয়টির কোন আঘাত না লাগে। দলটা তাই গতিমন্থর।

শ্রবণসীমায় আসতেই বালদুচ্চি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এল আমেরা থেকে এখানে এই তিন কিলোমিটার আসতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল।" দারু উত্তর করলেন না। পুরু সোয়েটার পরে বেঁটে গাট্টাগোট্টা লোকটি তাদের উঠে আসা দেখছিল। একবারও আরবটি তার মাথা তুলল না। তারা প্রাঙ্গণে উঠে আসলে পর দারু তাদের সম্ভাষণ জানাল। "ভেতরে এস। গরম হয়ে নাও।" বালদুচ্চি অতিকষ্টে ঘোড়া থেকে নামল কিন্তু রশি হাতছাড়া করল না। ঝাঁটা গোঁফের নীচে সে স্কুলমাস্টারের দিকে তাকিয়ে হাসল। রৌদ্রতপ্ত কপালের নীচে তার খুদে খুদে কাল চোখ আর বলিরেখাঙ্কিত মুখে তাকে মনোযোগী ও নিষ্ঠাবান বলেই মনে হয়। লাগাম ধরে দারু ঘোড়াটাকে

BanglaBook.org

চালাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। তারপর স্কুলে প্রতীক্ষারত লোকদুটির কাছে গেলেন। তিনি তাদের নিজের ঘরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "ক্লাশরুমটা গরম করে আসি, ওখানে আমাদের আরও আরাম হবে।" যখন তিনি অপর ঘরে ফিরলেন, বালদুচ্চি কোচের ওপর সটান। আরবকে বেঁধে রাখা দড়িটা খোলা আর আরবটি নিজে চুল্লীর পাশে জড়সড়। তার হাত তখনও বাঁধা, শেজটুপি পেছনে হেলে গেছে, জানলার দিকে তার দৃষ্টি। প্রথমেই দারুর নজর আকৃষ্ট করল তার নিগ্রোধাঁচের পুরু, মসৃণ অথচ থলথলে ঠোঁটদুটো। কিন্তু নাকটা তার তীক্ষ্ণ, চোখ কাল অথচ জ্বরগ্রস্ত। শেজের তলায় উদ্ধত কপাল, রৌদ্রদগ্ধ হয়েও শীতে বিবর্ণ মুখের ত্বকে উদ্বেগ ও বিদ্রোহের ছাপ দারু খেয়াল করলেন আরবটি মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে চোখে চোখ রেখে তাকাতেই। স্কুলমাস্টার বললেন "পাশের ঘরে যাও। তোমাদের জন্য একটু চা করে আনি।" বালদুচ্চি বললেন, "ধন্যবাদ, কি চাকরি রে বাবা। নিষ্কৃতি পেলে বাঁচি।" আরবীতে বন্দীকে বলল "চল"। আরব ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলিত হাতদুটি সামনে ঝোলান অবস্থায় স্কুলের দিকে চলল।

দারু চায়ের সঙ্গে নিজের চেয়ারটাও আনলেন। বালদুচ্চি এর ম'ধ্যে প্রথম ছাত্রের টেবিলে অধিষ্ঠিত আর আরবটি শিক্ষকের বেঞ্চে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে, ডেস্ক আর জানলার মাঝখানে রাখা চুল্লীতে তার মুখ ফেরান। দারু বন্দীকে চায়ের গ্লাস তুলে দিতে গিয়ে অপ্রস্তুত হলেন। "ওকে হয়তো এবার মুক্ত করা উচিত।"— "নিশ্চয়ই" বলে উঠল বালদুচ্চি "ওটা হাঁটার সময়ে দরকার ছিল।" সে উঠতে শুরু করল। কিন্তু দারু তার আগেই মেঝেতে গেলাস রেখে আরবের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে। লোকটি নীরবে তাঁকে জ্বরচোখে লক্ষ্য রাখছিল। তার হাত মুক্ত হলে, একটা ফোলা কব্জির সঙ্গে অন্যটা ঘষে সে চায়ের গ্লাস তুলে নিল আর ছোট্ট কিন্তু দ্রুত চুমুকে সেই জ্বলন্ত পানীয় গলাধঃকরণ করতে লাগল।

দারু বললেন, "বেশ, তাহলে তোমাদের কোথায় যাওয়া হবে।"

বালদুচ্চি চায়ের থেকে গোঁফ তুলেঃ "এখানেই, বাছা।"

—"মজার ছাত্র সব! এখানেই শোবে?"

—"না, আমাকে এল আমোরে ফিরতে হবে। এই দোস্তকে তুমি ত্যাঁগুইতে পাঠাবে। ওখানে ওর অপেক্ষায় এক পাঁচমিশেলি বস্তি।"

বালদুচ্চি দারুর দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ মুচকি হাসি তাকাল। মাস্টার বলল, "কি বলছ কি? ঠাট্টা করছ নাকি?"

"না। বাছা, এই হল আদেশ।"

"আদেশ? আমি কিন্তু..." দারু ইতস্তত করছিল। সে কর্সিকান বৃদ্ধকে আঘাত করতে চায় না। "কিন্তু, এসব আমার কাজ নয়।"

"কি? কি বলতে চাও তুমি? যুদ্ধে সব কাজই করতে হবে।"

"বেশ। তাহলে যুদ্ধ ঘোষণার অপেক্ষায় থাকব।" বালদুচ্চি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। "ঠিক আছে। এই হল আদেশ আর তা তোমার জন্যেই। লোকে বলছে, শুরু

BanglaBook.org

হল বলে। ওরা ঘনিয়ে আসা বিদ্রোহের আলোচনা করছে। কোনোভাবে, আমরা প্রস্তুত।"

দারু অবিচল ভাব বজায় রাখল। বালদুচ্চি বলল, "শোন বাছা। তোমাকে বোঝাচ্ছি কারণ তোমায় পছন্দ করি। এল আমোরে আমরা একডজন লোক ছোট্ট মহকুমাটা পাহারা দেওয়ার জন্য রয়েছি আর তাই আমাকে ফিরতেই হবে। এই চিড়িয়াকে তোমার হেপাজতে রেখে আমাকে এক্ষুণি ফিরতে হবে এটাই হুকুম। একে ওখানে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। ওর গ্রামে বিক্ষোভ চলছে, ওরাও ওকে ফেরৎ চায়। আগামীকাল দিনের মধ্যেই তুমি ওকে ত্যাঁগুইতে পৌঁছে দেবে। তোমার মত শক্তপোক্ত লোকের কাছে কুড়ি কিলোমিটার কিছুই নয়। তারপর তো কাম ফতে। তুমি ফিরে আসবে ছাত্রদের মধ্যে শান্ত জীবনে।"

দেওয়ালের পেছনে, শোনা যাচ্ছিল ঘোড়ার নাক ঝাড়া আর ক্ষুরের শব্দ। দারু জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আবহাওয়া এখন নিশ্চিতভাবেই পরিষ্কার, তুষারাকীর্ণ মালভূমির ওপর আলো ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত বরফ গলে যাবার পরে আবার শুরু হবে সূর্যের রাজত্ব, আবার পাথুরে প্রান্তর জ্বলে পুড়ে খাক হবে। আগামী কয়েকদিন এই মনিষ্যিহীন প্রান্তরে নিস্তরঙ্গ আকাশ থেকে শুকনো আলোক বর্ষিত হবে।

বালদুচ্চির দিকে ফিরে তিনি বললেন, "বলো তো, ও কি করেছিল?" পুলিশ মুখ খোলার আগেই তিনি শুধোলেন "ও ফরাসী বলতে পারে?" "না, একটা শব্দও নয়। একমাস ধরে ওকে খুঁজেছি আমরা কিন্তু ওরা ওকে লুকিয়ে রেখেছিল। ও এক সম্পর্কিত ভাইকে খুন করেছে।"

"ও কি আমাদের বিরুদ্ধে?"

"মনে হয় না। কিন্তু কিছু বলাও যায় না।"

"মারল কেন?"

"মনে হয় সাংসারিক ঝগড়া। হয়তো একজন অন্যজনের কাছে ফসল পেত। ব্যাপারটা স্বচ্ছ নয়। সংক্ষেপে বললে ও ওর ভাইকে কেটেছিল কাস্তে দিয়ে। যেমন ভেড়া কাটে টুক করে।..."

বালদুচ্চি গলার ওপর দিয়ে তলোয়ার টানার ভঙ্গী করল। আরবটির মনঃসংযোগ তার দিকে নিবদ্ধ, তাকে লক্ষ্য করছিল উদ্বেগে। এ মুহূর্তে দারুর লোকটির ওপর ক্রোধ জন্মাল, ক্রুদ্ধ হল সমস্ত মানুষের ওপর তাদের নোংরা শয়তানির জন্য, অন্তহীন ঘৃণা আর রক্তলোলুপ আচরণের কারণে।

ততক্ষণে কেটলী স্টোভের পর শব্দ করতে শুরু করেছে। বালদুচ্চিকে তিনি আরও চা দিলেন, একটু ইতস্ততঃ করে আরবটিকেও দিলেন, সে আবারও ব্যগ্রভাবেই পান করল। সে হাত তুলতেই তার পরিধানের ফাঁক দিয়ে তিনি দেখলেন তার মেদবর্জিত প্রশস্ত বক্ষস্থল।

বালদুচ্চি বলল, "ধন্যবাদ বন্ধু—এবার উঠব।" সে উঠে আরবের দিকে এগোল, পকেট থেকে একটা ছোট্ট দড়ি বের করল।

BanglaBook.org

দারু নীরস কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, "কি করছটা কি?" বিস্মিত বালদুচ্চি দড়িটা দেখাল।

"এর কোনই প্রয়োজন নেই।"

বৃদ্ধ পুলিশটি ইতস্তত করল।

"তোমার যা ইচ্ছে। নিশ্চয়ই তোমার বন্দুক আছে।"

"আমার গাদাবন্দুকটা রয়েছে।"

"কোথায়?"

"ট্রাঙ্কে।"

"ওটাকে তোমার বিছানায় রাখা উচিত।"

"কেন? আমার ভয় করার মত তো কিছু নেই।"

"খেপেছ, বাছা। যদি বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহলে আমরা সবাই ফাঁসব। আমাদের হালত একই।

"তখন নিজেকে বাঁচাব। ওরা যে আসছে তা তখন দেখতে পাব?"

বালদুচ্চি হাসতে থাকল। তার গোঁফ ঢেকে দিল সাদা দাঁতের শাড়ি।

"তোমার সময় আছে? বেশ। তাই বলি। সবসময়েই তুমি একটু খ্যাপাটে। এ জন্যই তোমাকে ভালবাসি। আমার ছেলেটাও এই রকমই।"

একই সঙ্গে সে রিভলবার বের করে টেবিলে রাখল।

"রেখে দাও। এখান থেকে এল আমোর পর্যন্ত আমার দুটো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই।

টেবিলের কাল রঙে রিভলবারটা চক্‌চক করছিল। পুলিশ তাঁর দিকে ফিরলে স্কুলমাস্টার চামড়া ও ঘোড়ার গন্ধ পেলেন। "শোন বালদুচ্চি" হঠাৎ দারু বলে উঠল, "সবকিছুই খুব বিরক্তিকর লাগছে, সবচেয়ে বেশি লাগছে তোমাদের এই লোকটিকে। কিন্তু ওকে আমি কারুর হাতে তুলে দিতে পারব না। প্রয়োজনে, লড়াই করব, কিন্তু ওই কাজটি আমার দ্বারা হবে না।"

বৃদ্ধ পুলিশটি তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ধীরে ধীরে সে বলল, "তুমি বোকা, আমিও এটা পছন্দ করি না। এত বছর করার পরেও মানুষকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে আমার অস্বস্তি হয় এমনকি লজ্জাই লাগে। কিন্তু আমরা যা খুশি করতে দিতেও পারি না।"

"আমি ওকে কারোর হাতে তুলে দিতে পারব না", দারু পুনরাবৃত্তি করল।

"আবারও বলছি, বাছা, এটা আদেশ।"

"বেশ তো। ওদের আবারও বল যা আমি বললাম: আমি ওকে কারোর হাতে তুলে দেব না।" বালদুচ্চি দৃশ্যতই একটু চিন্তিত। আরব ও দারুর প্রতি সে তাকাল। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল।

"না, ওদের কিছুই বলব না। আমাদের ছাড়াতে চাইলে, বেশ, আমি তোমার নামে নালিশ করব না। আমার ওপর আদেশ বন্দীকে হস্তান্তর করার আর আমি তাই করেছি। এখন তুমি এই কাগজটায় সই করে দেবে।"

BanglaBook.org

"এর প্রয়োজন নেই। আমি কখনও অস্বীকার করব না যে তুমি ওকে আমার হাতে ছেড়েছ।"

"আমার সাথে ইতরামো করো না। জানি তুমি সত্যি কথাই বলবে। তুমি এই এলাকার এবং একজন প্রকৃত মানুষ। কিন্তু সই তোমাকে করতেই হবে। এটাই বিধি।"

দারু দেরাজ টানলেন, এক ছোট্ট চৌকাকৃতি বেগুনিরঙের দোয়াত বের করে, তাতে লাল কাঠের হ্যান্ডেলে 'সার্জেন্ট মেজর' কলম দিয়ে সই করলেন। পুলিশ সতর্কভাবে কাগজটি ভাঁজ করে ব্যাগে ভরে ফেলল। তারপর অগ্রসর হল দরজার দিকে।

দারু বললেন, "তোমাকে এগিয়ে দিই।"

বালদুচ্চি বলল, "না, বিনয়ী হবার কোন কারণ নেই। তুমি আমাকে যথেষ্ট অপমান করেছ।"

সে আরবটির দিকে তাকাল, সে নিশ্চল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর দরজার দিকে ফিরল, "বিদায় বাছা" সে বলল। তার পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বালদুচ্চি জানালা দিয়ে একবার উঁকি মারল তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পায়ের শব্দও ধীরে ধীরে চাপা পড়ে গেল বরফের তলায়। দেওয়ালের পেছনে ঘোড়ার কাঁপুনি আর মুরগীছানার ছোটাছুটি শুরু হল। এক মুহূর্ত পরে বালদুচ্চিকে আবার জানলার সামনে ঘোড়ার লাগাম ধরে চলে যেতে দেখা গেল। উৎরাই পথে সে একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে চলতে থাকল। ধীরে ধীরে প্রথমে সে, তারপর তার ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে গেল। এক বড় পাথরের চাঁইয়ের পতন কানে এল। নিশ্চল কিন্তু আগাগোড়া তাকে নজরে রাখা বন্দীটির দিকে দারু অগ্রসর হলেন। স্কুলমাস্টার তাকে আরবীতে বললেন, "দাঁড়াও"। তারপর চললেন নিজের শোবার ঘরের দিকে। চৌকাট টপকানোর সময়ে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটল, ডেস্কের দিকে ফিরে এলেন, রিভলবার বের করে পকেটে পুরলেন। তিনি নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরে তিনি ডিভানে শুয়ে আস্তে আস্তে আকাশ কাল হয়ে আসা দেখলেন, শুনতে থাকলেন নীরবতা। এ সেই নীরবতা যা যুদ্ধের পরে পরেই তাঁর এখানে আসার প্রথম দিককার দিনগুলিতে অসহনীয় বোধ হত। এই উঁচু মালভূমির থেকে মরুভূমিকে আলাদা টেনেছে যে পাহাড় তারই পাদদেশের ছোট্ট শহরে একটি পদের জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি। সেখানে পাথুরে দেয়াল, উত্তরে সবুজ আর কাল, দক্ষিণে গোলাপী আর বেগুনী—চিরায়ত গ্রীষ্মের সীমান্ত নির্দেশ করছে। তিনি আরও উত্তরে মালভূমিতেই চাকরি পেলেন। বন্ধ্যা, পাথর অধ্যুষিত এই রাজ্যে প্রথম প্রথম তাঁর কাছে এই একাকীত্ব ও নীরবতা ছিল দুঃসহ। কোন কোন জায়গায় অবশ্য ভূমিকর্ষণের চিহ্ন দেখে চাষবাস বলে ভ্রম হতে পারে, কিন্তু আসলে তা হল নির্মাণকার্যের জন্য পাথর সংগ্রহের চিহ্ন। লোকে এখানে লাঙল দেয় পাথর সংগ্রহের জন্য। অন্যত্র গর্তে জমে থাকা মাটির স্তর চেঁচে নেয় গ্রামের ছোট্ট বাগানে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য। এ হল এই ধরণের; এখানকার তিন-চতুর্থাংশ পাথুরে। এখানে বসতি

BanglaBook.org

বেড়ে ওঠে, জাঁকজমক বাড়ে, তারপর উবে যায়। মানুষ আসে, একে অন্যকে ভালবাসে নয়তো নৃংশসভাবে লড়াই করে, তারপর মারা পড়ে। এই মরুভূমিতে কেউ গণনাতেও আসে না, সে অথবা তার বন্ধু। তা সত্ত্বেও দারু জানেন যে এই মরুভূমির বাইরেও তাদের দুজনের কেউ-ই বাঁচতে পারত না।

তার উঠে পড়ার সময়ে ক্লাশরুম থেকে কোন শব্দ আসছিল না। আশ্চর্য হলেন তার কেমন অনাস্বাদিত আনন্দ হয়েছিল ভেবে যে আরবটি ইতিমধ্যেই ভেগেছে আর তাঁকে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে একাই থাকতে হবে। কিন্তু বন্দী সেখানে ছিল। সে চুল্লীর এবং ডেস্কের মাঝে একদম চিৎ। তার উন্মুক্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছাতের দিকে। এই অবস্থায় তার পুরু ঠোঁট সহজেই দৃষ্টিগোচরে আর তাতে অসন্তোষের ছাপ। "এসো", দারু ডাকল, আরবটি উঠলো এবং তাকে অনুসরণ করল। শোবার ঘরে ঢুকে স্কুল মাস্টার জানলার নীচে টেবিলের কাছে একটি চেয়ারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন। আরব দারুর দিক থেকে একবারও চোখ না সরিয়ে সেখানে বসল।

"তোমার খিদে পেয়েছে?"

—"হ্যাঁ", বন্দী উত্তর দিল।

দারু দুটি জায়গা করলেন। ময়দা আর তেল নিলেন, চটকে একটা কেক পাত্রে বসালেন, ছোট গ্যাস চুল্লীটা জ্বালালেন। কেক তৈরী হওয়ার সময়, গুদামে গেলেন চিজ, ডিম, খেজুর আর জমাট দুধ আনতে। কেক তৈরী হয়ে গেলে তাকে জানলার ধারে বসিয়ে ঠাণ্ডা করতে দিলেন। জলে গুলে জমাট দুধ গরম করতে লাগলেন। তারপর ডিমগুলো ভেঙে অমলেট ভাজলেন। চলতে গিয়ে একবার তাঁর ডান পকেটে রাখা রিভলবারটা আটকাল। পাত্রটা নামিয়ে তিনি ক্লাশরুমে গিয়ে রিভলবারটা ডেস্কের দেরাজে রেখে এলেন। ঘরে যখন ফিরে এলেন, রাত গড়িয়েছে। আলো জ্বালালেন এবং আরবটিকে পরিবেশন করলেন। "খাও"—বললেন তিনি। লোকটি কেকের একটি অংশ তুলে নিল, ব্যগ্রভাবে মুখে নিয়ে গিয়ে থেমে গেল।

"আপনি?" সে বলল।

"তোমার পরে। আমিও খাব।"

পুরু ঠোঁট দুটি অল্প ফাঁক হল, আরব ইতস্তত করে তারপর রসিয়ে কেকে কামড় দিল।

খাওয়া শেষ হলে আরব স্কুলমাস্টারের দিকে তাকাল।

"আপনি কি বিচারক?"

—"কাল পর্যন্ত আমি তোমাকে পাহারা দেব।"

—"আমার সঙ্গে খাচ্ছেন কেন?"

—"খিদে পেয়েছে তাই।"

লোকটি চুপ করে গেল। দারু উঠলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। চালা থেকে একটা গোটানো খাটিয়া আনলেন, পাতলেন সেটা চুল্লী আর টেবিলের মাঝে নিজের বিছানার সাথে লম্বভাবে। এককোণে রাখা একটা বড় স্যুটকেশ সেটা ফোল্ডার রাখার শেলফ্

BanglaBook.org

হিসেবে ব্যবহৃত হত সেখান থেকে দুটো কম্বল বের করে ক্যাম্পখাটে পেতে দিলেন। তারপর থামলেন, অর্থহীনতা অনুভব করে নিজের বিছানায় বসে পড়লেন। কিছুই করার নেই বা প্রচেষ্টাও নেই। তিনি লোকটার দিকে তাকান। তাই তিনি তাকে দেখতে থাকলেন। কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন যে ওর মুখটা ক্রুদ্ধ। পারলেন না। শুধু দেখলেন তার কাল, উজ্জ্বল এবং জানোয়ারসুলভ মুখ।

"কেন মেরেছিলে ওকে?" কণ্ঠস্বরে ঘৃণার প্রকাশ নিজেকেই অবাক করল। আরব অন্যদিকে তাকাল।

"ও দৌড়াল। আমিও ওর পেছনে দৌড়ালাম।"

সে দারুর দিকে তাকাল। দু চোখে কাতর জিজ্ঞাসা।

"এখন, ওরা আমাকে কি করবে।"

"ভয় করছে?"

লোকটি জড়সড় হয়ে অন্যদিকে তাকাল।

"দুঃখ হচ্ছে?"

মুখ হাঁ করে আরবটি তাঁর দিকে তাকাল। কথার অর্থ তার বোধগম্য হয়নি। দারুর বিরক্তি হচ্ছিল। একই সাথে দুই বিছানার মাঝে এই দশাসই চেহারাটা সামনে অস্বস্তি এবং আত্মসচেতনতায় ভুগছিলেন।

"শুয়ে পড় ওখানে", অধীর হয়ে বলে উঠলেন। "এটা তোমার বিছানা।"

আরব নড়াচড়া করল না। সে দারুকে ডাকল ঃ 'শুনুন।'

মাস্টার তার দিকে তাকালেন।

"পুলিশ কি কাল ফিরে আসবে?"

"জানি না।"

"আপনি কি আমাদের সাথে যাবেন?"

"জানি না। কেন?"

বন্দী উঠে পড়ল আর কম্বলের ওপর গা এলিয়ে দিল, তার পা জানলায় দিকে। বৈদ্যুতিক বাল্বের আলো সোজা তার চোখে প্রতিহত হওয়ায় সে চোখ বুজে ফেলল।

"কেন?" দারু বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন। অন্ধ করে দেওয়া আলোর নীচেও পলক না ফেলে চোখ খোলার চেষ্টা করল আরব।

"আমাদের সঙ্গে এস", বললেন তিনি।

মাঝরাতে, দারু তখনও নিদ্রাহীন। তিনি বিছানায় যান সমস্ত বস্ত্র ত্যাগ করে। সাধারণত তিনি নগ্নভাবেই শোন। কিন্তু যখন তাঁর মনে হল যে শোবার ঘরে তিনি নগ্ন, তিনি ইতস্তত করলেন। অনুভব করলেন রক্ষণহীনতা এবং পুনরায় জামাকাপড় পরার চিন্তা তাঁকে প্রণোদিত করল। তারপর তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন। অনেক খারাপ ব্যাপার তিনি অতিক্রম করে এসেছেন, আবার যদি করতে হয়, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে দু'টুকরো করবেন। নিজের বিছানা থেকে, তিনি তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন, চিৎ হয়ে শুয়ে, নিশ্চল আর চোখ ঝলসান আলোর নীচে চোখ বুঁজে।

BanglaBook.org

দিলেন, অন্ধকার জমাট বেঁধে এলো। ধীরে ধীরে জানলার ধারে পুনরায় রাত জীবন্ত হয়ে উঠল যেখানে মৃদুমন্দগতিতে আকাশ গতিবান। মাস্টার তার সামনে শায়িত দেহটি শীঘ্রই অনুভব করলেন। আরব তা সত্ত্বেও নড়াচড়া করল না, কিন্তু তার চোখ মনে হয় উন্মুক্ত। স্কুলের চারপাশে হাল্কা বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে। হয়তো তা মেঘ সরিয়ে দেবে আর তাহলেই সূর্য ফিরে আসবে।

রাতে বাতাস বাড়ল। মুরগীছানারা একটু ছটোপাটি করল তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরব দারুর দিকে পিছন করে পাশ ফিরল, তাঁর মনে হল সে গোঙাচ্ছে। তারপর শুনলেন ক্রমশঃ ভারী ও নিয়মিত হয়ে আসা মানুষের শ্বাস। সেই নিঃশ্বাস ধ্বনি যা তার এত নিকটে, না ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। এই ঘরে বছরখানেক হল তিনি একাই ঘুমোন, সেখানে এই উপস্থিতি তাকে বিরক্ত করছিল। বিরক্তিকর আরও এজন্য যে চাপিয়ে দেওয়া সৌভ্রাতৃত্ব বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশ ওয়াকিবহাল হয়েই তিনি মানতে চাননি। মানুষ, তা সে সৈনিক বা বন্দী যাইহোক না কেন, যদি একই ঘরে থাকে, এক অদ্ভুত বন্ধনে বাঁধা পড়ে। শত পার্থক্য সত্ত্বেও, অস্ত্র ও বস্ত্রের ব্যবধান ঘুচলেই তারা প্রতি সন্ধ্যায় মিলিত হয় প্রাচীন জনপদের স্বপ্নে ও শ্রান্তিতে। দারু গা ঝাড়া দিলেন। এইসব বোকামি তাঁর না পছন্দ। ঘুমের খুব প্রয়োজন।

একটু পরেই যেই আরব সামান্য নড়াচড়া করছে, দারু তখন ঘুমোয়নি। বন্দীর দ্বিতীয় ঝটকায় তিনি আড়ষ্ট হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক। আরব হাতে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল, ঠিক যেন নিশিতে পাওয়ার ঘোরে। বিছানায় বসে সে নিশ্চল প্রতীক্ষায়, দারুর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই যেন কিছু উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। দারুও নড়ছেন না। হঠাৎ তাঁর মনে এল যে রিভলবারটা এখনও ডেস্কের দেরাজেই ভরা। ভাল হচ্ছে এখনই একটা কিছু করা। তাও তিনি বন্দীকে লক্ষ্য করতে থাকলেন। সে একই দুলকি চালে, পা রাখল মেঝেতে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। দারু প্রায় তাকে ডেকে ফেলেছিলেন কিন্তু আরব তখনই স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে শুরু করল, শুধু চরাচর আশ্চর্য নীবর। সে এগোল চালা অভিমুখী পিছনের দরজার দিকে। সাবধানে শিকলি খুলে চালার দিকে এগিয়ে গেল, দরজা বন্ধ না করে শুধু ভেজিয়ে রাখল। দারু তখনও নিশ্চল "কেটে পড়ছে", দারুর মাথায় একটাই ভাবনা। "যাক বাঁচোয়া।" তাও তিনি কান পেতে রাখলেন, মুরগীগুলোও নড়াচড়া করছে না, তাহলে লোকটা মালভূমির পথে। অস্পষ্ট একটা জল পড়ার শব্দ যা ঠিক তাঁর বোধগম্য হল না, অন্ততঃ ততক্ষণ, যতক্ষণ না আরবের অবয়ব আবার দোরগোড়ায় হাজির, ধীরেসুস্থে দরজা বন্ধ করে তারপর নিঃশব্দে এসে শুয়ে পড়ল। দারুও তার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আরো পরে অতল ঘুমের দেশে তিনি যেন শুনতে পেলেন স্কুলবাড়ির চারপাশে চোরা পদশব্দ। "স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন দেখছি!" বিড়বিড় করলেন আপন মনে। তার পরেই তলিয়ে গেলেন অঘোর ঘুমের দেশে।

যখন ঘুম ভাঙল, আকাশ পরিষ্কার। নড়বড়ে জানলার কারণে শীতল তাজা হাওয়া

BanglaBook.org

ঢুকছিল। আরব কম্বলের তলায় কুঁকড়ে ঘুমোচ্ছে, খোলা মুখ আর সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে। কিন্তু দারু যখন তাকে ধাক্কা দিলেন, সে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে না চিনেই তাকাল—সেই চাউনিতে উন্মত্ততা আর আতঙ্কের অভিব্যক্তি এতই স্পষ্ট যে মাস্টার এক পা পিছিয়ে এলেন। "ভয়ের কিছু নেই। আমি। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।" আরব মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। ধীরে তার মুখে প্রশান্তির ছাপ ফিরে এল, কিন্তু তার অভিব্যক্তিতে শূন্যতা এবং বিহ্বলতা।

কফি তৈরী। দুজনে পান করল। দুজনেই ক্যাম্পখাটে বসে কেক কামড় দিল। তারপর দারু আরবকে চালার দিকে নিয়ে গেলেন এবং হাত মুখ ধোবার জায়গা দেখিয়ে দিলেন। তিনি ফিরে এলেন ঘরে, কম্বল আর ক্যাম্পখাট ভাঁজ করে রাখলেন, নিজের বিছানা তুলে ঘরটা গুছিয়ে ফেললেন। এবার স্কুলের পথ দিয়ে প্রাঙ্গণে পৌঁছলেন। সূর্য নীল আকাশে তখন সবে উঁকি দিয়েছে। নরম ঝক্‌ঝকে আলোয় বন্ধ্যা প্রাঙ্গণ বিধৌত। দুর্গম পথে স্থানে স্থানে তুষার গলছে। উঁকি মারছে পাথুরে জমি। মালভূমির কিনারে ঝুঁকে মাস্টার এই উষর প্রান্তরের ধ্যান করছিলেন। বালদুচ্চির কথা মনে এল। তিনি তাকে আঘাত করেছেন। তাকে এমনভাবে ফেরত পাঠিয়েছেন যেন তার সাথে কোন সম্পর্কই রাখতে চান না। তিনি যেন তখনও পুলিশটির বিদায় সম্ভাষণ শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন না কেনই বা এখন এত আশ্চর্য্য শূন্য আর অরক্ষিত লাগছে। ঠিক সেই সময়েই স্কুলের অন্যপ্রান্তে বন্দী কেশে উঠল। দারু অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন তার দিকে কান পাতলেন, তারপর ক্রোধে একটা পাথর ছুঁড়লেন। বরফে তলিয়ে যাবার আগে হাওয়ায় তা শিস কেটে গেল। মানুষটির নির্বোধ অপরাধ তাঁকে বিরক্ত করেছিল, কিন্তু তাকে ধরিয়ে দেওয়াটাও তাঁর সম্মানের পরিপন্থী। শুধু এই চিন্তাই তাঁকে অবমাননায় করে তুলেছিল অসুস্থ। তাঁর নিজের লোকেরা যারা আরবটিকে তাঁর হেপাজতে পাঠিয়েছে ও স্বয়ং সেই আরবটি যে একটি মানুষকে খুন করার সাহস ধরে অথচ পালানোর মুরোদটুকুও নেই দুপক্ষকেই তিনি যুগপৎ শাপশাপান্ত করছিলেন। দারু উঠে দাঁড়ালেন। প্রাঙ্গণে একটি পাক খেলেন, নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন, তারপর স্কুলে ফিরে গেলেন।

আরব চালার সিমেন্ট মেঝের ওপর ঝুঁকে দু'আঙুলে তার দাঁত পরিষ্কার করছিল। দারু তার দিকে তাকিয়ে বললেন—'এস'। তিনি ঘরে ফিরলেন, বন্দীর আগে আগে। সোয়েটারের ওপর শিকারের জ্যাকেট লাগালেন, পড়লেন জুতো। আরব শেজ এবং চটি না পরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। দুজনে স্কুলধারে গেলেন এবং মাস্টার দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে সঙ্গীকে বললেন "যাও", লোকটি নড়ল না। দারু বললেন, 'আসছি'। আরব বাইরে বেরোল, দারু শোবার ঘরে ফিরলেন, বিস্কুট, খেজুর ও চিনির একটা প্যাকেট বানালেন। বেরোনোর আগে, ক্লাসরুমে নিজের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি মুহূর্তখানেক ইতস্তত করলেন; তারপর স্কুলের সীমানা পেরিয়ে দরজায় তালা লাগালেন। বললেন, "এই হল রাস্তা"। পূব অভিমুখে হাঁটতে লাগলেন, বন্দী অনুসরণ করল। স্কুল থেকে কিছুদূরে গিয়েই এক ক্ষীণ শব্দ তাঁর কানে এল, পায়ে পায়ে ফিরে

BanglaBook.org

এসে স্কুলবাড়ির চারপাশ অনুসন্ধান চালালেন। কেউ নেই। আরব কিছু না বুঝেই তার দিকে তাকিয়ে। দারু বললেন, "চল"। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর তাঁরা সূচাকৃতি একটা চুনাপাথরের খণ্ডের সামনে বিশ্রাম নিলেন। বরফ খুবই দ্রুত গলছিল। সূর্য জমে থাকা জল শুষে নিচ্ছে, দ্রুত শুকিয়ে সাফ করছে মালভূমি আর বাতাসের মতই তা কম্পিত। তাঁরা হাঁটতে শুরু করতেই ভূমিতে পদতলে শব্দ উঠছে। মাঝে মধ্যে তাদের সামনে দিয়ে আনন্দধ্বনি করে উড়তে থাকল। বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার সাথে দারু এই শীতল আলোয় যেন চুমুক দিচ্ছিলেন। এই পরিচিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এক ধরণের আনন্দ তার মনে উদয় হচ্ছিল। নীল আকাশের নীচে হলদে হয়ে আসা এই প্রান্তর। আরও একঘণ্টা হাঁটলেন, দক্ষিণমুখো হয়ে নামতে নামতে। তাঁরা ভঙ্গুর পাথরের এক থ্যাবড়া টিলায় আরোহণ করলেন। সেখান থেকে, মালভূমি ঢালু হয়েছে পূবদিকে এক ঢালু সমতল পানে সেখানে শীর্ণ কিছু গাছপালাও দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণদিকে পাথরের স্তূপ সমগ্র নিসর্গকে এক বিশৃঙ্খলার রূপ দিয়েছে।

দারু দুইদিক দেখলেন। দিগন্তে কেবল আকাশ। কোন মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। আরবের দিকে ফিরলেন, সে তাঁর দিকে চেয়ে এক নির্বোধের দৃষ্টিতে। দারু তার হাতে প্যাকেটটা দিলেন। তিনি বললেন—"নাও। এখানে খেজুর, রুটি আর চিনি আছে দুদিনের মত। আর এই রইল হাজার ফ্রাঁ।" আরব প্যাকেট আর টাকাটা নিল, তুলে নিল বুকের কাছে, যেন সে জানে না যা তাকে দেওয়া হল তা দিয়ে সে কি করবে। মাস্টার বললেন তাকে পূবদিকে আঙুল তুলে, "ওই দ্যাখো। এই রাস্তা ত্যাঁগুইয়ের দিকে গেছে। দু'ঘণ্টা হাঁটলে ত্যাঁগুই পৌঁছবে। ওখানে পুলিশ এবং প্রশাসন আছে। ওরা তোমাকে খুঁজছে।" আরব পূবদিকে তাকাল, তখনও তার বুকে ধরা প্যাকেট ও টাকা। দারু তার হাত ধরে একটু রূঢ়ভাবেই সিকিপাক ঘুরিয়ে দিলেন দক্ষিণমুখে। তাদের পায়ের তলাতেই এক পথের ক্ষীণ আভাস। "এই পথ গেছে মালভূমির ওধারে। একদিন পুরো হাঁটলে, তুমি জলাভূমি ও যাযাবরদের খোঁজ পাবে। রীতি অনুযায়ী ওরা তোমাকে আশ্রয় ও অভ্যর্থনা দেবে।" আরব এখন দারুর দিকে তাকাল এক আতঙ্কের অভিব্যক্তি নিয়ে। "শুনুন", সে বলল। দারু মাথা নেড়ে বললেন, "না, একটাও কথা আর নয়। আমি এবার তোমাকে ছেড়ে যাব।" তিনি তার দিকে পিছন ফিরলেন, স্কুলের দিকে লম্বা দু'পা বাড়ালেন। একটু ইতস্তত করে চলচ্ছক্তিহীন আরবকে দেখলেন তারপর স্থান ত্যাগ করলেন। কয়েক মিনিট ধরে শীতল ভূমিতে নিজের পদধ্বনি শুনলেন, কোন দিকে দৃকপাত করলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি ঘুরলেন। আরব তখনও সেখানে, পাহাড়ের কিনারে, হাত পাশে ঝুলছে আর একদৃষ্টিতে মাস্টারের দিকে তাকিয়ে। দারু অনুভব করলেন তাঁর গলা বুজে আসছে। অধৈর্যে শপথ দিলেন তারপর হাত নাড়িয়ে আবার চলা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে তিনি অনেক পথ চলে এসেছেন, আবার দাঁড়ালেন এবং তাকালেন। আর কাউকে টিলার ওপরে দেখা যাচ্ছে না।

দারু ইতস্ততঃ করলেন। সূর্য তখন আকাশের উঁচু সীমায়, প্রায় তাঁর কপাল

BanglaBook.org

পোড়াতে শুরু করেছে। প্রথমে মাস্টার কিছুটা অনিশ্চিতভাবে পরে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই পা চালাতে শুরু করলেন। যখন ছোট্ট টিলাটার চূড়ায় পৌঁছলেন, তখন দরদর করে ঘামছেন। খুব দ্রুত আরোহণ করেছেন তিনি, তারপর চূড়ায় থেমেছেন প্রায় দম আটকে। দক্ষিণে পাথুরে প্রান্তর নীল আকাশের যেন সীমারেখা, কিন্তু পূবে সমতলে ইতিমধ্যে উষ্ণ বাষ্প উঠে আসছে। সেই ক্ষীণ আবরণে দারু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করলেন যে আরব ধীরে ধীরে বন্দীশালার পথে এগোচ্ছে।

কিছু পরে ক্লাশরুমের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু না দেখেই লক্ষ্য করছিলেন যে সুউচ্চ আকাশ থেকে প্রভাতী আলো সমগ্র উপত্যকা জুড়ে ব্যাপ্ত। তাঁর পিছনে ব্ল্যাকবোর্ডে বয়ে চলা ফরাসী নদীগুলোর মধ্যে কাঁচাহাতে চকে লেখা এক বার্তা যা তিনি এইমাত্র পড়লেন, "তুমি আমাদের ভাইকে ধরিয়ে দিয়েছ। তোমাকে এর মূল্য চোকাতে হবে।" দারু আকাশের দিকে তাকালেন। মালভূমির দিকে এবং সব ছাড়িয়ে সমুদ্রে ছড়িয়ে থাকা অদৃশ্য ভূমির দিকে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল যাকে এত ভালবেসেছেন, তিনি সেখানে পরিত্যক্ত।

ফরাসী থেকে ভাষান্তর :পলাশ ভদ্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কর্মব্যস্ত শিল্পী

আমাকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করো আর সম্মুখের সমুদ্রে নিক্ষেপ
করো... কারণ আমি জানি কেবল আমার জন্য এই
প্রবল ঝঞ্ঝা তোমার উপর নেমে এসেছে।

জোনা ১ ২

শিল্পী গিলবের জোনাস নিজের ভাগ্যকে খুব বিশ্বাস করত। আসলে, ভাগ্যবিধাতাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করলেও অন্য লোকদের ধর্মকেও সে কিন্তু সম্মান করত, এমনকি একটু আধটু পছন্দও করত। কিন্তু নিজে কোনকিছুর জন্য উপযুক্ত না হয়েও প্রাপ্যের অনেক বেশি যে পেয়ে যাচ্ছে, এমন একটা ধারণা মনের ভেতর অস্পষ্টভাবে গড়ে উঠেছিল বলে তার নিজের বিশ্বাস অটুট ছিল পুণ্যবলের ওপর। তাই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, এক গন্ডা সমালোচকদের ভেতর কোনজন তার মধ্যে প্রথম প্রতিভার বিচ্ছুরণ খুঁজে পেয়েছে, এই নিয়ে তর্কাতর্কিতে যখন মেতে উঠল, সে কোন বিস্ময় প্রকাশ করেনি। যদিও তার প্রশান্তিকে কেউ কেউ আত্মতুষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষমেশ সেটাই তার প্রকৃত বিনয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল। নিজের গুণে নয়, সব কিছুই ভাগ্যবিধাতার আশীর্বাদে পাওয়া বলে জোনাস বিশ্বাস করত।

যখন এক ছবির ব্যবসায়ী তাকে সব উদ্বেগ দূর করার মত মাসিক একটা বৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিল, সে একটু বেশিরকম অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে পড়ার সময় থেকে স্থপতি রাতো জোনাস আর তার ভাগ্যকে ভালোবেসে এসেছে। সেই রাতো যখন তাকে বোঝাতে লাগল যে মাসোহারাটা কিন্তু কষ্টেসৃষ্টে দিন চালাবার চেয়ে বেশি নয়, কেননা ব্যবসায়ীটি কোন ঝুঁকি নিতে চায় না, জোনাস বলল, 'তাতে কিছু যায় আসে না...।' রাতো নিজে যা কিছু পেয়েছে, তার জন্য তাকে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে, বন্ধুকে ধমক দিয়ে বলল, 'কিছু যায় আসে না কথাটার মানে কি? তোকে দরাদরি করতেই হবে।' কিন্তু সে ধমকেও কোন কাজ হল না। জোনাস মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল আর ব্যবসায়ীকে বলল, 'আপনি যা বলবেন, তাই হবে।' তারপর বাবার প্রকাশন সংস্থার বাঁধা চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে শুধু ছবি আঁকতে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিজেই বলল, 'সত্যি কি সৌভাগ্য!'

তখন সে মনে মনে ভাবছিল, 'এটাই আমার সেই পুরনো ভাগ্য।' ফেলে আসা দিনগুলোর কথা যতদূর মনে পড়ে, এই একই ভাগ্য কাজকর্মে তাকে সাহায্য করে

BanglaBook.org

Jonas, ou l'artiste au travail

এসেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাবামায়ের জন্য তার এক স্নেহভরা কৃতজ্ঞতা রয়ে গেছে, কারণ প্রথমত তাঁরা তাকে হেলাফেলা করে মানুষ করেছেন। যার ফলে সারাদিন ধরে দিবাস্বপ্ন তৈরি করতে গিয়ে কোন বাধা পড়েনি, দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের দায়ে ভাগ্যিস তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। সেটা অবশ্য ছিল বাবার তৈরি করা একটা ছুতো, এটা যে একটা অন্য মাত্রার ব্যভিচার, সেটাই তিনি অভিযোগে স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি স্ত্রীর পরোপকার করে বেড়াবার নেশাকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে ছিলেন শৌখিন ধর্মপ্রাণা মহিলা, বেদনার্ত মানবতার কল্যাণে নিজের দেহ ও মনকে সঁপে দেওয়ার মধ্যে তিনি অন্তত কোন অন্যায় দেখেননি। কিন্তু স্বামী দেবতাটি চেয়েছিলেন, নিজে সতী স্ত্রীর পরম গুরু হয়ে থাকতে। এই ওথেলোটি বলতেন, 'গরীবগুলোর সঙ্গে ওকে ভাগবাঁটোয়ারা করে থাকতে থাকতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।'

দুজনের সেই ভুল বোঝাবুঝিটা জোনাসের কাছে আশীর্বাদ হয়ে নেমে এসেছিল। তার বাবা মা অন্যান্য বিবাহবিচ্ছিন্ন দম্পতির সন্তানদের পরবর্তী জীবনে ধর্ষকামী খুনি হয়ে যাওয়ার নানা ঘটনা শুনে এবং পড়ে তাকে লাই দিয়ে মাথা খাওয়ার হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন, যাতে এমন সর্বনেশে ক্রমবিকাশের ফুলকি গোড়াতেই নেভানো যায়। তাঁদের ধারণা ছিল, বাবা মায়ের জন্য সন্তানকে যে আবেগের ধাক্কা সইতে হয়, তার ফলাফল যতই তুচ্ছ হোক না কেন, তার চেয়েও তাঁরা বেশি উদ্বিগ্ন, কেননা অদৃশ্য প্রলয় বিরাজ করে সবচেয়ে গভীরে। জোনাসকে কেবল জানাতে হতো যে সে নিজে সারাদিন দিব্যি ভালোই রয়েছে। কারণ তার বাবা মা শুধু আতঙ্কিত হওয়ার জন্যই সব সময় চিন্তা করতেন। তার প্রতি তাঁদের মনোযোগ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল অথচ বাচ্চাটি কিছুই চাইত না।

অপরিবর্তিত দুর্ভাগ্য শেষমেশ জোনাসকে বন্ধু রাতোর চেহারায় এক অনুগত ভাইকে পাইয়ে দিল। রাতোর বাবা মা ছেলের স্কুলের ছোট্ট বন্ধুটিকে খুব যত্নআত্তি করতেন, তার অসুখী অবস্থার জন্য তাঁদের কষ্ট হত। তাঁদের সহানুভূতিভরা কথাবার্তা নিজেদের শক্তিমান ব্যায়ামবীর ছেলেকেও নিশ্চয় উদ্বুদ্ধ করেছিল। যার নির্বিকার সাফল্য ইতিমধ্যে সম্মান পেতে শুরু করেছে সেই জোনাসকে নিজের নিরাপদ পক্ষপুটে রাখবার ইচ্ছা রাতোকে পেয়ে বসল। অন্য সব কিছুর মত উৎসাহ ভরা সরলতায় জোনাস পেয়েছিল সম্মান আর সৌজন্যমিশ্রিত বন্ধুত্ব।

বেশি চেষ্টা চরিত্র না করে জোনাস যখন গতেবাঁধা পড়াশোনা শেষ করল, তখন আবার সেই শুভগ্রহ তাকে বাবার প্রকাশন সংস্থায় টেনে আনল, একটা চাকরি পাইয়ে দিল আর তার সঙ্গে পরোক্ষভাবে শিল্পচর্চার পথ খুলে দিল। ফ্রান্সের অগ্রগণ্য এক প্রকাশক হিসেবে তার বাবার মত ছিল, বইয়ের বাজার যেহেতু চিরকাল মন্দা, তাই বই ভবিষ্যতের একমাত্র প্রতিনিধি। তিনি বলতেন, 'ইতিহাসেই রয়েছে, লোকে যত কম বই পড়ে, তার চেয়ে বই বেশি কেনে।' তাই তিনি সাধারণত তাঁর কাছে পাঠানো পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখতেন না, ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিতেন কেবল লেখকের ব্যক্তিত্বের

BanglaBook.org

নিরিখে অথবা বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার আকর্ষণে (এই বিষয়ে বলতে হয়, যৌনতাই হল একমাত্র বিষয় যা সব সময় প্রাসঙ্গিক এবং প্রকাশককেও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হয়), বইয়ের আকার প্রকার অন্য ধাঁচে করার চেষ্টায় এবং নিখরচায় বই প্রচারের কাজে তিনি নিজে সময় কাটাতেন। ঠিক এই সময় পাণ্ডুলিপি পাঠ বিভাগে ঢুকে পড়ে জোনাস হাতে অখণ্ড অবসর পেল আর ছবির সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠল।

নিঃসন্দেহে এই প্রথম সে নিজের ভেতর আবিষ্কার করল এক অদম্য উৎসাহ, দিনগুলোকে আঁকার কাজে লাগাল, খুব একটা চেষ্টা চরিত্র না করেই নিজের কাজে সফলও হতে লাগল। অন্য কোন কিছুই তাকে আকর্ষণ করত না। ঠিকমত বয়সে বিয়েটাও করে উঠতে পারল না। কেননা ছবির কাজ ততক্ষণে তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে। এক টুকরো দয়ালু হাসি শুধু সে জমিয়ে রেখেছিল অন্যান্য মানুষ আর ধরাবাঁধা জীবনের যে কোন পরিস্থিতির জন্য, তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য সেই হাসিটুকু সময়ে সময়ে সে ছড়িয়ে দিত। এক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় জোনাস প্রেমের ফাঁদে পড়ল, বন্ধুকে পিছনে বসিয়ে রাতো তখন উদ্দামবেগে মোটর সাইকেল চালাচ্ছিল। জোনাসের ব্যান্ডেজ বাঁধা ডানহাত অকেজো হয়ে রইল কিছুদিন। সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনার মধ্যেও সে ভাগবিধাতার ক্ষমতার পরিচয় আবার পেয়েছিল, কেননা তাঁর সহায়তা ছাড়া লুইজ পুল্যাঁর দিকে ইচ্ছা থাকলেও অন্য কোন সময় তাকাবার ফুরসত পাওয়া যেত না।

বলে নেওয়া ভাল, রাতোর কথামত লুইজকে এমন কিছু আহামরি দেখতে নয়। নিজের বেঁটে খাটো দশাসই চেহারার জন্য রাতো কেবল লম্বা মেয়েদের পছন্দ করত। সে বলত, 'পোকাটার মধ্যে এমন কি পেলি তুই, জানি না বাপু।' এটা ঠিক যে লুইজের চেহারা ছোটখাটো, ত্বক, চুল আর চোখের রং কালো বটে কিন্তু শরীরের গড়নটা ছিল আঁটোসাঁটো। তার সঙ্গে ছিল টলটলে মুখশ্রী। আসলে প্রচন্ড পরিশ্রমী ছিল বলে এই পোকাটাই লম্বা আর শক্তপোক্ত জোনাসের মন মজিয়ে দিয়েছিল। লুইস শুধু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। এমন ব্যস্ততা জোনাসের পছন্দমাফিক নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা আর সুবিধা ভোগ করার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল। লুইজ প্রথমে নিজেকে সাহিত্যের জন্য উৎসর্গ করল, আসলে তখন সে ভেবেছিল প্রকাশনার কাজ জোনাসকে বোধহয় খুব আকর্ষণ করে। এলোমেলোভাবে সে সব কিছু পড়তে লাগল আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু নিয়ে কথা বলার মত লায়েক হয়ে গেল। গুণমুগ্ধ জোনাস এবার নিজেকে আর পড়াশোনার গন্ডিতে বেঁধে রাখতে চাইল না। কারণ লুইজ খুব ভালভাবে সব কিছুর খবর বুঝিয়ে দেয় আর সমকালীন নানা আবিষ্কারের নির্যাসটুকু যতখানি সম্ভব জানিয়ে দেয়। লুইজ জোর গলায় দাবি করত, 'তোমার কখনো বলা উচিত নয় যে অমুক বা তমুক বদমাশ কিংবা কুচ্ছিত লোক, আসলে ও বদমাইশির বা কুচ্ছিত হওয়ার ভান করে।' ফারাকটা গুরুত্বপূর্ণ, রাতোর কথামত ব্যাপারটা সমস্ত মানব জাতিকেই নিন্দা করার জায়গায় ঠেলে দেয়। কিন্তু লুইজ প্রশ্নটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে বোঝায় যেহেতু সত্যটাকে ভাবাবেগ ভরা সংবাদমাধ্যম আর

BanglaBook.org

দার্শনিক সব আলোচনাগুলো একই সঙ্গে সমর্থন করে, তাই এটা ধ্রুবসত্য এবং অন্য কোনরকম আলোচনাসাপেক্ষ নয়। 'তুমি যা বলবে', জোনাস বলল আর ভাগ্য নিয়ে স্বপ্ন দেখার নিষ্ঠুর আবিষ্কারের কথা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল।

জোনাসের ধ্যানজ্ঞান যে শুধু ছবিকে ঘিরে, এ কথাটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে লুইজ সাহিত্যের সংস্রব একেবারে ছেড়ে দিল। নিজেকে এবার সে উৎসর্গ করল দৃশ্যকলার প্রতি, মিউজিয়াম আর প্রদর্শনীশালায় তার আনাগোনা শুরু হল। সে সব জায়গায় জোনাসকেও টেনে নিয়ে যেতে লাগল, জোনাস অবশ্য ভালোভাবে বুঝতে পারত না তার সমসাময়িক শিল্পীরা ঠিক কি আঁকছে, নিজের শিল্পসত্তার সরলতা নিয়ে সে একটু চিন্তায় পড়ে গেল। তবু ছবির খুঁটিনাটি ব্যাপারে সবকিছু জানতে পেরে সে খুশি হয়ে উঠল। সবকিছু নিশ্চিতভাবে জানবার ফলে যে শিল্পীর কাজ সবেমাত্র দেখেছে, তার নামটাই সে পরদিন ভুলে যেত। বাস্তবে যে কেউ কিছু ভোলে না এই অবশ্যপালনীয় কথাটি লুইজ সাহিত্য সংসর্গের সময় থেকে মাথায় রেখেছিল, কথাটি সে জোনাসকে ঠিক সময়ে গুরুত্ব দিয়ে মনে করিয়ে দিত। ভাগ্যবিধাতা নিশ্চয়ই জোনাসকে উদ্ধার করেছিলেন। স্মৃতির নিশ্চয়তা আর বিস্মরণের আরাম, এই দু-নৌকায় পা দিয়ে তার দিন দিব্যি চলে যাচ্ছিল।

জোনাসের প্রতিদিনের জীবনে আত্মোৎসর্গের যে মণিমুক্তো লুইজ ঢেলে দিয়েছিল, সেগুলোই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। যে কাজ যে কোন স্বাভাবিক মানুষের স্বল্প সময়ের জীবনকে আরো স্বল্প করে দেয়, সেই জামাকাপড়, জুতো কেনার দায় থেকে এই লক্ষ্মী মেয়েটি তাকে অব্যাহতি দিয়েছিল। সময় নষ্ট করার হাজারো যান্ত্রিক কাজ বিনা বাক্যব্যয়ে সে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল, সে সবের মধ্যে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তার দম আটকানো পুস্তিকা থেকে আভ্যন্তরীণ রাজস্ব দপ্তরের সদা পরিবর্তিত মেজাজ। 'এসব না হয় ঠিক আছে', রাতো বলল, 'কিন্তু তোমার বদলে ও নিজে তো দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে না।' যেতে না পারলেও ফোন করে সব থেকে সুবিধাজনক সময়ে দেখা করার ব্যবস্থা লুইজ করে দিত, ছোট্ট গাড়িটার তেল বদলাবার কথা খেয়াল রাখত, ছুটি-ছাটাতে দূরের হোটেলে বেড়াতে গেলে আগে থেকে ঘর ঠিক করে রাখত, উনুনের জন্য কয়লা মজুত থাকত, যে সব উপহার জোনাস অন্যদের দিতে চায়, সে সব নিজে কিনে আনত, নিজে পছন্দ করে জোনাসের হয়ে ফুল পাঠাত, এমনকি কোন কোন সন্ধ্যায় সময় করে ওর অনুপস্থিতিতে বাড়িতে ঢুকে বিছানা গুছিয়ে রাখত যাতে ঘরে ফিরে ওকে আর ঝঞ্ঝাটে না পড়তে হয়।

অবশ্য এই একই উৎসাহে তারপর সে নিজে ঐ বিছানায় ঢুকে পড়েছিল। মেয়রের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে নিতেও আবার ভোলে নি, জোনাসের প্রতিভা স্বীকৃত হওয়ার দুবছর আগে তাকে টাউনহলে বিয়ে করতে টেনে নিয়ে গেল। লুইজ মধুচন্দ্রিমার আয়োজনও এমনভাবে করেছিল যাতে কোন মিউজিয়াম ঘুরে দেখার কাজ বাদ না পড়ে। বাড়ি পাওয়ার সমস্যাতেও খুব একটা ভুগতে হয়নি। মধুচন্দ্রিমা থেকে ফিরে এসে তিন কামরার একটা ফ্ল্যাটে তারা থাকতে শুরু করল। তারপর খুব চটপট

BanglaBook.org

এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম দিল। তৃতীয় সন্তানের ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছিল যখন জোনাস প্রকাশন সংস্থার চাকরি ছেড়ে ছবি নিয়ে মেতে উঠল।

এটা বলতেই হবে, মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুইজ সন্তানদের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। তখনও সে স্বামীর কাজে হাত লাগানোর চেষ্টা করত বটে। কিন্তু শেষমেশ সময় করে উঠতে পারত না। ঠিক ঠিকভাবে বলতে গেলে, জোনাসকে অবহেলা করার জন্য কষ্ট হত, কিন্তু তার কড়াধাঁচের মন এরকম হা-হুতাশ করে সময়কে নষ্ট করতে চাইত না। সে বলত, 'কোন উপায় নেই। আমাদের দুজনের নিজের নিজের কাজের জায়গা রয়েছে।' জোনাস, যা কিছুই ভাবুক না কেন, লুইজের এই কথায় আনন্দ পেত, কারণ সেই সময়ের অন্যান্য শিল্পীদের মত সে-ও নিজেকে কেবল কারিগর বলে ভাবতে চাইত। কারিগরটিকে অবশ্য একটু অবহেলিত হতে হত আর নিজের জুতো নিজেকেই কিনতে হত। এইভাবে যে সব কিছু মেনে চলতে হয়, ব্যাপারটা বুঝেও জোনাস আবার উল্লসিত হতে চাইত। দোকানে দোকানে ঘোরাঘুরি করার জন্য তাকে পরিশ্রম নিশ্চয়ই করতে হচ্ছে, কিন্তু তার বদলে নিঃসঙ্গ কয়েক ঘণ্টা বিবাহের আশীর্বাদ হিসাবে তার কাছে নেমে আসছে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বসার ঘরের কারণ সময় এবং স্থান একসঙ্গে চারদিক থেকে কমে যাচ্ছিল। বাচ্চাদের জন্ম, জোনাসের পেশা, বদ্ধ জায়গা, মাসোহারার ভদ্রতা সব মিলিয়ে তাদের বড় বাসা ভাড়া নিতে আটকাচ্ছিল, আবার লুইজ আর জোনাসের নিজেদের কাজকর্মের জন্য বেশি জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। রাজধানীর পুরনো এলাকায় আঠারোশ শতকের এক ভাড়াবাড়ির তিনতলায় তাদের কামরা। নতুনের খোঁজে শিল্প সাধনা কেবল এই রকম পুরনো পরিবেশে সম্ভব, এই নীতিতে বিশ্বাসী অনেক শিল্পী তখন এরকম বদ্ধ ঘরে থাকত। জোনাসও সেই একই বিশ্বাসের শরিক হয়ে এমন ঘরে থাকতে পেরে তোফা আনন্দে মজেছিল।

কামরার প্রাচীনত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু সম্প্রতি-নেওয়া কিছু ব্যবস্থার ফলে কেবলমাত্র কয়েকটি জায়গায় বাতাস বইত। অনেক উঁচু সিলিংয়ের ঘরগুলি প্রকান্ড বড় বড় জানালা দিয়ে সাজানো, রাজসিক মেজাজে বিচার করলে এগুলি নিশ্চয় তৈরি হয়েছিল উৎসব এবং অনুষ্ঠানের জন্য। কিন্তু শহুরে ভিড়ের চাপ আর রাজকীয় সম্পত্তির আয়ের হাতছানি পরম্পরাগত মালিকদের বাধ্য করেছিল এই অতি বড় বড় ঘরগুলো কেটে মাঝখানে দেয়াল তুলতে আর আস্তাবলের সংখ্যা বাড়াতে, যাতে ভাড়াটের পালকে চড়াভাড়ায় থাকতে দেওয়া যায়। কমবেশি সব মালিকই সেই 'চৌকো খোলা জায়গার' গুণ গাইত। এই খোলা জায়গার সুবিধার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। জানা কথা, মেঝের সমান্তরাল করে ঘরের মধ্যে দেয়াল তোলা যায় না, যদি যেত, তাহলে বাড়িওলারা আরেকটু ত্যাগ স্বীকার করে বেড়ে-চলা প্রজন্মের জন্য আরো আশ্রয় জোগাতে নিশ্চয় দ্বিধা বোধ করত না। বিশেষত যে প্রজন্ম কেবল ঝুঁকে পড়েছে বিয়ে আর বাচ্চার জন্ম দেওয়ার জন্য। 'চৌকো খোলা জায়গা'গুলো খুব একটা যে ভালো, তা নয়। ঘরগুলোকে শীতকালে গরম রাখা

BanglaBook.org

মুশকিল, এই সমস্যাটাই দুর্ভাগ্যক্রমে বাড়িওলাদের বাধ্য করেছে গরম রাখার খরচের জন্য ভাড়া আরো বাড়াতে। গরমের সময় ঘরগুলো আবার বিশাল জানালার জন্য আক্ষরিক অর্থে আলোর বন্যায় ভেসে যায়। জানালার কপাটে কোন খড়খড়ির বালাই নেই। জানালার খাড়াই আর ছুতোরের কাজের খরচার জন্য বাড়িওলারা সেই খড়খড়ি লাগাতে খুব একটা উচ্চবাচ্য করত না। ভারী মোটা পর্দা খড়খড়ির বদলে দিব্যি কাজ দিতে পারে আর খরচারও সাশ্রয় করতে পারে, তবে সেটা অবশ্য ভাড়াটের নিজের দায়িত্ব। আরো বলা যায়, বাড়িওলারা ভাড়াটের দিকে সাশ্রয়ের হাত বাড়াতে খুব যে একটা অনিচ্ছুক ছিল, তা নয়। নিজেদের গুদামের পর্দা তারা কেনা দামে ছেড়ে দিত। বাসস্থান জোগানোর মাধ্যমে মানবপ্রীতি ছিল তাদের পেশা। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এই নতুন ধরনের রাজামশাইরা ছিলেন তুলো আর ভেলভেটের দোকানদার।

জোনাস কামরার সুবিধেগুলো দেখে খুশিতে ফেটে পড়ে খুঁতের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। ঘর গরম করবার বাড়তি খরচাপাতি নিয়ে বাড়িওলার সঙ্গে দরাদরি না করে সে বলল, 'আপনি যা বলবেন।' লুইজের সঙ্গে বসে সে ঠিক করল, শোয়ার ঘরে পর্দা টানালেই কাজ চলে যাবে আর বাকি জানালাগুলো ফাঁকা পড়ে থাকুক। নির্মল হৃদয়ের মানুষটি বলল, 'আমাদের কিছু লুকোনোর নেই।' বড় ঘরটি দেখে জোনাস যার পর নাই মুগ্ধ, তার সিলিংটা এমন উঁচুতে যে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করা অসম্ভব। বাইরে থেকে ফ্ল্যাটে সরাসরি ঢুকবার দরজা এই ঘরে লাগানো, ঘরের পরেই ছোট একটি হলঘর, তার লাগোয়া সারি বাঁধা আরো দুটি ঘুপচি ঘর। হলের শেষে রান্নাঘর, শৌচাগার আর স্নানঘর হিসেবে ভূষিত একটি ফাঁকা কোণ। সত্যি সত্যি এটি স্নানঘর হতে পারত যদি অন্তত লম্বালম্বিভাবে ধারাকলটি লাগানো থাকত এবং তার নিচে কেউ নিশ্চলভাবে দাঁড়াতে পারত।

অস্বাভাবিক উঁচু সিলিং আর বদ্ধ ঘরের স্বল্প পরিসর কামরাগুলোকে কাঁচের বাক্সে রাখা সমান্তরাল নলের মত এক অদ্ভুত চেহারা দিয়েছিল, এখানে সর্বত্র দরজা আর জানালা, আসবাব রাখার জন্য দেয়ালে কোন জায়গা নেই, এখানে সব মানুষ খাড়াই অ্যাকোরিয়ামে বোতলবন্দি দৈত্যের মত ঘুরে বেড়ায়। এছাড়া, এখানে সব জানালাগুলির মুখ বাইরের প্রাঙ্গণের দিকে খোলা, পাশের বাড়ির খোলা জানালার একেবারে মুখোমুখি, তার ভেতর দিয়ে তাকালে খুঁজে পাওয়া যায় দূরের অন্যসব জানালার উঁচু অবয়ব, সেগুলির মুখ আবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রাঙ্গণের দিকে খোলা। আনন্দে জোনাস বলে উঠেছিল, 'এ যে আয়না বসানো ঘর!' রাতোর কথামত ছোট দুটি ঘরের একটিকে মূল শয়নকক্ষ হিসাবে বেছে নেওয়া হল, আরেকটি রাখা হল আসন্ন শিশুটির জন্য। বড় ঘরটিকে দিনের বেলা জোনাসের স্টুডিও, সন্ধ্যেবেলা আর খাওয়ার সময় বৈঠকখানা হিসেবে বেছে নেওয়া হল। জোনাস বা লুইজ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে রান্নাঘরেও চটজলদি একটু খেয়ে নেওয়া যায়, এমন জায়গা পাওয়া গেল। রাতো নিজে বুদ্ধি বিবেচনা করে দারুণ এক বুদ্ধি খাটালো, টানা দরজা, গোটানো তাক আর ভাঁজ-করা টেবিল দিয়ে সে আসবাবপত্রের দৈন্যতা ঢেকে দিল,

BanglaBook.org

সব মিলিয়ে সেই অদ্ভুত ফ্ল্যাটের ভেতর এক হরেকরকমবা চেহারা ফুটে উঠেছিল।

ঘরগুলো যখন ছবি আর বাচ্চাতে ভরে গেল, তাদের সব কিছু আবার নতুন করে সাজানোর কথা ভাবতে হল। তৃতীয় সন্তানটির জন্মের আগে জোনাস বড় ঘরে কাজ করত। লুইজ শোওয়ার ঘরে সেলাই-ফোঁড়াই করত, আর দুটি বাচ্চা শেষ ঘরটির দখল নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড বাঁধাত, ফ্ল্যাটের অন্যান্য জায়গায় লুটোপুটি খেত। এখন সবাই মিলে ঠিক করল, নবজাতককে স্টুডিওর এক কোণে রাখা হবে, যেখানে জোনাস ক্যানভাসগুলোকে জড়ো করে পর্দা-ঘেরা আড়ালের মত একটা জায়গা তৈরি করেছিল, এর ফলে বাচ্চাটিকে হাতের নাগালে রাখা আর তার ডাকাডাকিতে সাড়া দেওয়ার সুবিধে হয়ে গেল। তবে জোনাসকে কখনো বাচ্চার জন্য ব্যতিব্যস্ত হতে হয়নি, কারণ তার গতিবিধির সব কিছুই ছিল লুইজের নখদর্পণে। বাচ্চার কান্নার পূর্বাভাস পেলেই অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে লুইজ স্টুডিওতে এসে ঢুকত। শুধু তারই জন্য এত চিন্তাভাবনা দেখে বিচলিত জোনাস একদিন লুইজকে বোঝাতে গেল যে, সে অতখানি স্পর্শকাতর নয়, পায়ের আওয়াজ পেলেও দিব্যি খোশমেজাজে সে কিন্তু কাজ চালিয়ে যেতে পারে। লুইজ উল্টে তাকে জানালো, বাচ্চার ঘুম ভাঙাতে চায় না বলেই সে নিঃশব্দে আসে। মায়েদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে আর নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রাণখোলা হাসি হাসল জোনাস। হুটহাট হামলা করার চেয়ে চুপিসারে ঐভাবে ঘরে ঢোকাটাই যে বেশি অস্বস্তিকর, সে কথা আর স্বীকার করতে সাহস পেল না। প্রথমত ঐভাবে ঘরে ঢুকতে অনেকক্ষণ সময় নেয় লুইজ, দ্বিতীয়ত চলাফেরায় ফুটে ওঠে এক ধরনের মূকাভিনয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, পিছনে হেলে-পড়া কাঁধ, শূন্যে-ওঠানো পা—লুইজের এসব কর্মকান্ডের দিকে মনোযোগ গিয়ে পড়বেই। এই কর্মকান্ড এমনকি তার ঘোষিত নীতিরও বিরুদ্ধে, কেননা স্টুডিও ভর্তি এলোমেলো ছড়ানো ক্যানভাসে যে কোন সময়ে ধাক্কা খাওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। তেমনটি হলে শব্দ শুনে বাচ্চা জেগে উঠতে পারে, তখন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে, এসব কিছুই বিবেচনা করতে হয়। এরপর বাবা নিজের ছেলের ফুসফুসের পরাক্রম দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে জড়িয়ে ধরতে ছুটবে এবং স্ত্রী এসে তাকে তাড়াতাড়ি রেহাই দেবে। তারপর জোনাস আবার ক্যানভাস আর ব্রাশ হাতে তুলে নিয়ে উল্লাসভরে শুনবে ছেলের একগুঁয়ে রাজকীয় গলার আওয়াজ।

ঠিক এই সময়ে জোনাসের সাফল্যে অনেক বন্ধু জুটে গেল। সেসব বন্ধুরা টেলিফোনে কিংবা আচমকা এসে যোগাযোগ করত। টেলিফোনটাকে অনেক চিন্তাভাবনা করে স্টুডিওতে রাখা হয়েছিল, সেটা কেবলই বাজত আর বাচ্চার ঘুমের দফারফা করত, ফোনের জরুরি আওয়াজের সঙ্গে শিশুর কান্না মিশে যেত। তখন হয়ত লুইজ অন্য বাচ্চাদের দেখভাল করতে ব্যস্ত। তবু তাদের নিয়েই পড়িমরি করে ছুটত ফোন ধরতে, বেশির ভাগ সময়েই এসে কিন্তু দেখতে পেত জোনাসের এক হাত বাচ্চা আরেক হাত ব্রাশ আর রিসিভারে জোড়া। ফোনে হয়ত ভেসে আসছে দুপুরের খাওয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ এক নিমন্ত্রণ। তার সঙ্গে কেউ খেতে চাইছে দেখে জোনাস

BanglaBook.org

অবাক হয়ে যেত কারণ কথাবার্তায় সে নিজে খুব নীরস। সারাদিন কাজ করে সে সন্ধেবেলায় বেরোতে চাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে বেশির ভাগ সময় বন্ধুটি কেবল লাঞ্চের সময়ে ফাঁকা থাকত এবং আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে শুধু লাঞ্চটুকুর জন্যই ফাঁকা থাকত, প্রিয় জোনাসের কাছেই তো শুধু এই আবদার করা যায়। প্রিয় জোনাস অগত্যা রাজি হয়ে বলত, 'তুমি যা বলবে!' তারপর ফোন রেখে দিয়ে বলত, 'আমার জন্য অন্যেরা সত্যি কত চিন্তাভাবনা করে!' এরপর লুইজের হাতে বাচ্চাকে তুলে দিত। কাজে ফিরে যাওয়ার পরে পরেই এবারে লাঞ্চ বা ডিনারের সময় হয়ে যেত। জায়গা করে নেওয়ার জন্য ক্যানভাসগুলোকে সরাতে হত, ভাঁজ-করা টেবিলটাকে খুলতে হত, তারপর বাচ্চাদের নিয়ে খেতে বসত। খাওয়ার সময় জোনাস আধ-শেষ করা ছবিটার দিকে চোখ বোলাত, খাওয়া শুরু করার সময় তো বটেই, তাছাড়াও মাঝে মাঝে খেয়াল করে দেখত বাচ্চাগুলো চিবোতে আর গিলতে বড় বেশি সময় নিচ্ছে, তাদের জন্য প্রতিবার খাওয়া শেষ করতে অনেক দেরি হচ্ছে। খবরের কাগজে অবশ্য সে পড়েছিল ধীরে সুস্থে খাওয়াটা হজমের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাই প্রতিটি খাওয়া তার কাছে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট।

নানা উপলক্ষ্যে নতুন বন্ধুরা হামেশাই এসে জড়ো হত। একমাত্র রাতো, রাতের খাওয়া শেষ না হওয়া অবধি কোনদিন আসেনি। সারাদিন সে নিজের অফিসে কাজ করত, তাছাড়া ছবি আঁকিয়েদের দিনের বেলা কাজ করার কথাটা সে জানত। জোনাসের নতুন বন্ধুদের প্রায় সবাই কিন্তু শিল্পী আর সমালোচক জাতের। কেউ কেউ ছবি আঁকে, কেউ কেউ ছবি আঁকতে শুরু করবে আর বাদবাকিরা যা কিছু ছবি আঁকা হয়েছে অথবা হবে, তাই নিয়েই ব্যস্ত। সবাই দৃঢ়ভাবে শিল্পের জন্য শ্রম দেওয়াটাকে অনেক উঁচুতে মর্যাদা দেয়। আর কেবলই অভিযোগ করে এই শ্রমের সাধনা করতে গিয়ে বর্তমান জগতের প্রতিষ্ঠানগুলো কতরকমভাবে বাধার সৃষ্টি করছে, এমনকি শিল্পীর পক্ষে অপরিহার্য গভীর চিন্তা করবার সেই পরিবেশও এখন আর নেই। সারা বিকেল ধরে তারা এই নিয়ে গজগজ করে যেত, তার মধ্যে কাজ করে যাওয়ার জন্য জোনাসের কাছে তারা আবার ঝুলোঝুলি করত। তাদের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করতে বলত, আবার নিজেরা তো অশিক্ষিত বর্বর নয়, শিল্পীর সময়ের মূল্য বোঝে বলে তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করার কথাও বলত। এত বন্ধু-বান্ধবের সামনে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে জোনাস ছবির কাছে খুশি হয়ে ফিরে যেত, তখন সে আর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে দাঁড়াত না, কোন টুকরো গল্প শুনে হাসতও না।

এত সাধাসিধে ব্যবহার পেয়ে বন্ধুরা আরো জমিয়ে বসল। তাদের শুভাকাঙ্খা এত সাচ্চা তারা যে খাওয়া-দাওয়ার সময়টাও ভুলে যেতে লাগল। বাচ্চাদের স্মৃতিশক্তিটা অবশ্য তাদের থেকে আরেকটু ভাল ছিল। তারা ছুটে গিয়ে অতিথিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, চেঁচামেচি করত, এক কোল থেকে আরেক কোলে ঘুরতে ঘুরতে আদর খেত। অবশেষে প্রাঙ্গণের বাইরে একটুকরো আকাশে ধীরে ধীরে আলো মরে আসত। তখন

BanglaBook.org

জোনাস হাতের তুলি নামিয়ে রাখত। এবার পড়ে-থাকা খুঁদকুড়োটুকু ভাগাভাগি করে খাওয়ার জন্য বন্ধুদের ডাক দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত আড্ডা হত। সে সব কথাবার্তা অবশ্য শিল্প নিয়েই, তবে তার মধ্যে বিশেষভাবে থাকত অক্ষম শিল্পী, অন্যের সৃষ্টি চুরি-করা আঁকিয়ে, নিজের ঢাক নিজে পেটানো লোকজনদের কথা, বক্তারা নিজেরা অবশ্য এসব শ্রেণীভুক্ত নয়। দিনের প্রথম আলোর সুবিধে নেওয়ার জন্য জোনাস তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে পছন্দ করত। এটা যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা সে জানত, কেননা প্রাতঃরাশ ঠিক সময়ে তৈরি হবে না আর সে নিজে ক্লান্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু আরেকদিকে, পুরো একটা সন্ধ্যাবেলা জুড়ে নিঃসন্দেহে শিল্পচর্চার উপযোগী এতশত ব্যাপার শিখতে পেরে সে আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠত। সে বলত, 'শিল্পের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে কোনকিছুই নষ্ট হয় না। এ কেবল ভাগ্যের জোর।'

বন্ধুদের সঙ্গে এরপর যোগ দিল শিষ্যদের দল, জোনাসের তখন রীতিমতো অনুরাগীবৃন্দ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে সে একটু হকচকিয়ে গেল। সে নিজে এখনও সব কিছু আবিষ্কার করার অপেক্ষায়। তার কাছ থেকে অন্যে আবার কি শিখবে? তার শিল্পীসত্তা এখনো অন্ধকারে চারদিক হাতড়াচ্ছে, সে আবার কি করে অন্যকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবে? তারপর অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরে গেল, শিষ্য হলেই যে কারো কোনকিছু শিখবার ইচ্ছে থাকবে, তা নয়। বরং উলটো চিত্রটাই বেশির ভাগ জায়গায় দেখা যায়, প্রভুকে শিক্ষা দিয়ে নিঃস্বার্থ সুখ পাওয়ার জন্যই মানুষ অন্যের শিষ্য হয়। তাই এরপর থেকে এমন সম্মান পেয়ে তৃপ্ত হওয়াটাকে সে বিনীতভাবে মেনে নিল। শিষ্যরা তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল, সে কি এঁকেছে আর কেনই বা এঁকেছে। এইভাবে ধীরে ধীরে নিজের ছবির মধ্যে জোনাস নানা গুণের সমাহার আবিষ্কার করে বেশ অবাক হয়ে গেল, আঁকতে গিয়ে এত ব্যাপার-স্যাপারের কথা সে কখনো তো ভাবেনি। নিজেকে সে হত দরিদ্র বলে ভাবত। এতদিন পরে শিষ্যদের কল্যাণে নিজেকে ধনী বলে বুঝতে পারল। সদ্য আবিষ্কার করা এই সম্পদের মুখোমুখি হয়ে মাঝে মাঝে সে নিজের মধ্যে একটু গর্বের ছোঁয়া অনুভব করতে লাগল। সে বলত, 'যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা তো সত্যি। ছবির পেছনে ঐ মুখটা জেগে থাকবে। ওরা যে কি এক পরোক্ষ মানবিকতার কথা বলছে, সেটা বুঝতে পারছি না বটে, তবু ঐ কাজটা করে ফেলে আমি সত্যি সত্যি অনেক উঁচুতে পৌঁছতে পেরেছি।' তারপরেই অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি নিজের অস্বস্তিকর দক্ষতাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বলত, 'আসলে আমার ভাগ্যটাই অনেক উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেছে। লুইজ আর বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে বাড়িতে বসে আমি ভালই আছি।'

এছাড়া শিষ্যদের আরো একটা সুবিধে ছিল, তারা জোনাসকে নিজের ব্যাপারে আরো কড়া হতে চাপ দিচ্ছিল। নিজেদের কথাবার্তায় তারা জোনাসের নীতিজ্ঞান আর বিশেষ করে অদম্য শক্তির ব্যাপারে তাকে এত উঁচু আসনে বসিয়ে দিয়েছিল যে সেখানে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করার জায়গা ছিল না। ছবির কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ

BanglaBook.org

আঁকবার পর ফের কাজ শুরু করার আগে চিনি বা চকোলেটের একটু টুকরো খুঁটে খাওয়ার অভ্যেস তার ছিল, এবার সেই পুরনো অভ্যেসকে জলাঞ্জলি দিতে হল। একা থাকলে যদিও বা এই দুর্বলতাটুকুকে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রশ্রয় দেওয়া যেত, কিন্তু নৈতিক উন্নতিসাধনায় সাহায্য করার জন্য শিষ্য আর বন্ধুরা প্রায় সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে থাকত। তাদের সামনে চকোলেট চুষে সে অস্বস্তিতে ভুগতে চাইত না, আর এরকম নিচু প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়ে তাদের দুর্দান্ত সব আলোচনাকে ভন্ডুল করে দিতেও সে চাইত না।

নিজস্ব নান্দকিতায় বিশ্বস্ত থাকবার জন্য শিষ্যরা তাকে আরো চাপ দিচ্ছিল। ক্বচিৎ কদাচিৎ এক আলোর ঝলক এসে বাস্তবকে আচমকা নতুন করে চিনিয়ে দিয়ে যেত। এই ঝলক দেখবার জন্য সে এতদিন ধরে পরিশ্রম করে এসেছে। কাজেই নিজের নান্দনিক জ্ঞান তার কাছে ভাসা-ভাসা এক ধারণামাত্র। শিষ্যদের আবার নানা মতামত, বৈপরীত্য আর নিরপেক্ষতায় ভরা, এ ব্যাপারে কোন ঠাট্টাতামাশা তারা সহ্য করবে না। জোনাসের মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালখুশি মত চলতে ইচ্ছে হয়েছে, খেয়ালখুশি ভাবটাই শিল্পীদের একমাত্র বাধ্য বন্ধু। কিন্তু শিষ্যদের মতামতের বাইরে-আঁকা কোন ছবি দেখে তাদের ভুরু যেভাবে কুঁচকে যেত, সেটা খেয়াল করে জোনাসকে নিজের শিল্প নিয়ে আবার আরেকটু ভাবতে হয়েছিল, এটুকুই ছিল তার সুবিধা।

এছাড়া নিজেদের কাজের ওপরে জোনাসকে মতামত দিতে বাধ্য করিয়ে শিষ্যেরা আরেকদিক থেকে যথেষ্ট উপকার করেছিল। বাস্তবিকপক্ষে, এমন একটা দিনও যেত না, যেদিন কেউ না কেউ কোনরকমে স্কেচ-করা একটা ছবি আনেনি, তখন হয়ত সে ক্যানভাসে নিজে আঁকছে, এবার সেই শিষ্য সব থেকে ভালোভাবে আলো পাওয়ার জন্য জোনাস আর ক্যানভাসের মাঝখানে নিজের ছবিটাকে এনে রাখত। শুধু একটা মতামত পাওয়ার জন্য। এতদিন অবধি একটা ছবির মূল্যায়ন ঠিকঠাকভাবে করতে না পারার জন্য সে মনে মনে লজ্জা পেত। হাতে-গোনা যে কটা ছবি মনকে নাড়া দিয়েছিল, সেগুলো বাদে বাদবাকি সব জ্যাবড়াভাবে রং বোলানো। সব কিছুই তার কাছে একইরকম দুর্দান্ত আর সাধাসিধে বলে মনে হত। এর ফলে বাধ্য হয়ে তাকে মতামত দেওয়ার একটা তহবিল বানাতে হল, মতামতগুলো কমবেশি একটু আধটু বদলাত। কেননা রাজধানীর অন্য শিল্পীদের মত তার শিষ্যেরা যথেষ্ট প্রতিভার অধিকারী, যখন তারা জোনাসকে ঘিরে থাকত, প্রত্যেককে খুশি করার জন্য সে আলাদা আলাদা মানের মাপকাঠি ঠিক করে দিত। এই আনন্দভরা কর্তব্য এইভাবে তাকে শিল্পকলা নিয়ে কথা বলার জন্য বাছাই-বাছাই শব্দ তালিকা আর মতামত জড়ো করতে বাধ্য করল। এ কাজ করতে গিয়ে তবু তার দয়ালু মনে কোন তিক্ততার জন্ম হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি সে বুঝে গেল যে, শিষ্যেরা তার কাছ থেকে কোন সমালোচনা চাইছে না। ওসবের কোন দাম নেই, তাদের দরকার উৎসাহ পাওয়া আর সম্ভব হলে শুধু প্রশংসা। প্রশংসাকে অবশ্য একটু চেহারায় দেখাতে হবে। জোনাস নিজের ধীরস্থির

BanglaBook.org

ভাব নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। সেই ভাব ধরে রাখার জন্য তাকে ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে হচ্ছিল।

এইভাবে জোনাসের সময় কেটে যায়। চেয়ারে-বসা বন্ধু আর ছাত্রদের মাঝখানে বসে বসে সে ছবি আঁকে। তার ইজেলের চারদিক ঘিরে এখন চেয়ারগুলো সাজানো। এছাড়া পাড়াপড়শিদের পথ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে-পড়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারা আর ভিড় বাড়িয়ে চলার উপসর্গ তো প্রায়ই লেগে থাকে। এখন সে কেবল আলোচনা করে, মতামত জানায়, তার কাছে জমা-দেওয়া ছবি খুঁটিয়ে দেখে, লুইজকে কখনো দেখতে পেলে একটু হাসে, বাচ্চাদের ঠাণ্ডা করে, মহা উৎসাহে ফোন ধরে কথা বলে। এর মধ্যে একবারও তুলি নামিয়ে না রেখে আধখানা শেষ-হওয়া ছবিতে মাঝে মাঝে রঙের পোঁচ দেয়। একদিক দিয়ে বলা যায়, তার জীবন এখন পূর্ণ, এক ঘণ্টার জন্যেও সময় নষ্ট হয় না, একঘেঁয়েমি থেকে তাকে বাঁচিয়েছে বলে সে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয়। আবার অন্যদিকে দেখা যাচ্ছিল যে ছবি শেষ করতে গিয়ে তাকে অনেক বেশি রঙের পোঁচ এখন দিতে হচ্ছে, এখন মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছে একঘেঁয়েমির একটা সুবিধা অন্তত আছে, পরিশ্রম করলে একে এড়ানো যায়। কিন্তু এবার বন্ধুরা যে রকম মনোযোগী হয়ে উঠতে লাগল, জোনাসের কাজকর্ম সে তুলনায় কমে আসতে লাগল। একেবারে একা থাকার দুর্লভ মুহূর্তগুলোতেও আবার রাশ তুলে নিতে তার বড় ক্লান্ত লাগত। এইসব মুহূর্তে সে শুধু এক নতুন রাস্তার স্বপ্ন দেখত, যেখানে বন্ধুত্বের আনন্দের সঙ্গে মিশে যাবে একঘেঁয়েমির শক্তি।

লুইজের কাছে ব্যাপারটা নিয়ে সে কথা বলতে গেল। লুইজ নিজেই এখন প্রথম দুটি সন্তানের বড়-হওয়া আর ঘর ছোট হয়ে-যাওয়া নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়েছে। লুইজ বলতে লাগল যে বড় দুটিকে না হয় বড় ঘরে রাখা যাক, ওদের বিছানাটা পর্দা দিয়ে ঢেকে দিলেই হবে'খন। তারপর বাচ্চাটাকে ছোট ঘরে নিয়ে এলে যখন তখন ফোনের আওয়াজে আর সে জেগে উঠবে না। বাচ্চার জন্য বেশি জায়গা লাগবে না বলে জোনাস ছোটঘরটাকেই এবার স্টুডিও বানিয়ে ফেলতে পারে। তাহলে বড় ঘরটা দিনের বেলায় জমায়েতের জন্য কাজ দেবে। জোনাসও ইচ্ছেমত দুটো ঘরেই ঘুরে ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা কিংবা ছবি আঁকার কাজ চালাবে, তার জন্য একটু ফাঁকা জায়গা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাটাও তো বুঝতে হবে। তাছাড়া বড় ছেলেমেয়েকে বিছানায় শোয়ানোর অজুহাতে সন্ধেবেলার আড্ডার সময়টা কাটছাঁট করার সুযোগও পাওয়া যাবে। এক মুহূর্ত চিন্তা করে জোনাস বলল, 'দারুণ ব্যাপার।' লুইজ বলল, 'তাছাড়া, তোমার বন্ধুরা যদি একটু আগে আগে গা তোলে, তাহলে আমরা আরেকটু বেশি নিজেদের দিকে তাকাতে পারি।' জোনাস মুখ তুলে লুইজের দিকে তাকাল। একটা বিষাদের ছায়া যেন ঐ মুখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। মনটা নাড়া খাওয়ার পরে লুইজকে জড়িয়ে ধরে সে পরম মায়াভরে চুমু খেল। লুইজ নিজেকে তার কাছে সঁপে দিল, এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, বিয়ের ঠিক পরের সুখের দিনগুলো যেন ফিরে এসেছে। তারপরেই লুইজ নড়েচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল,

BanglaBook.org

জোনাসের পক্ষে ঘরটা বোধহয় সত্যি খুব ছোট। লুইজ একটা ভাঁজ-করা মাপ-দেওয়ার ফিতে নিয়ে এল, আবিষ্কার করা গেল যে জোনাসের আর শিষ্যদের অসংখ্য ক্যানভাস মিলে বড় ঘরে এমন জটলা তৈরি হয়েছে যে এইখানে কাজ করবার জায়গাটা ঐ ছোটঘরের চেয়ে এমন কিছু বড় নয়। জোনাস চটপট আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলল।

সৌভাগ্যবশত, যত কম সে কাজ করছিল, তার নামডাক তত বেশি ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য সবাই আগ্রহভরে অপেক্ষা করে থাকে আর শুরুর আগে থেকেই প্রশংসা আরম্ভ হয়ে যায়। তবে সত্যি বলতে কি, হাতে গোনা কয়েকজন সমালোচক স্টুডিওতে নিয়মিত আসত। তাদের মধ্যে শুধু দুজন একটু নরমগরম সমালোচনা করছিল। এই ছোটখাট দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটার জন্য শিষ্যদের রাগ করাটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। শিষ্যরা জোর দিয়ে বলত, প্রথম পর্বের ছবিগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু এখনকার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো ভবিষ্যতের এক বিপ্লবের জন্য সংকেত পাঠাচ্ছে। যতবার প্রথম পর্বের কাজগুলোকে মহৎ বলে চালানো হয়, জোনাস নিজের ভেতরে একটু বিরক্তিবোধ টের পায়। তারপর নিজেই নিজেকে ধমক দেয়, সেই ছবিগুলোকে ধন্যবাদ জানায়। শুধু, রাতো গজগজ করত, 'আহাম্মকের দল সব, ওরা তোকে একটা পুতুলের মত নির্জীব রাখতে চায়। তোর বেঁচে থাকার অধিকার ওরা কেড়ে নেবে।' জোনাস কিন্তু শিষ্যদের পক্ষ নিয়ে বলত, 'এসব তুই বুঝবি না। আমি যা কিছু করি না কেন, তার সবটুকুই তোর ভাল লাগে।' রাতো হাসত, 'হ্যাঁ, ঠিক। তোর ছবিকে আমি পছন্দ করি না, তোর আঁকা ছবিকে আমি শুধু ভালোবাসি।'

ধীরে ধীরে সব জায়গাতেই ছবির জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। সাড়া-জাগানো একটা প্রদর্শনীর পর ছবির ব্যবসায়ী নিজে থেকে মাসোহারা আরো বাড়ানোর প্রস্তাব দিল। জোনাস সম্মতি জানিয়ে ঘোষণা করল, এর ফলে সে যে কতখানি কৃতজ্ঞ, তা বলে বোঝানো যায় না। ব্যবসায়ীটি বলল, 'যে কোন লোক কিন্তু আপনার কথা শুনে ভাববে, টাকাটাই এখন আপনার কাছে অনেক বড় ব্যাপার।' এমন সহৃদয়তার পরিচয় শিল্পীকে একেবারে নিরস্ত্র করে দিল। যাই হোক, এরপরে সে যখন নিজের একটা ছবি কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বিক্রির জন্য দিয়ে দিতে চাইল, ব্যবসায়ী শুধু জানতে চাইল, প্রতিষ্ঠানটা খুব একটা 'শাঁসালো' কিনা। জোনাস সে ব্যাপারে কিছুই জানত না। ব্যবসায়ীটি তখন উপদেশ দিল, চুক্তিপত্রে যেন বিক্রি করার নিজস্ব অধিকারের শর্ত থাকে আর ঠিকঠাকভাবে যেন এই শর্ত মেনে চলা হয়। ব্যবসায়ী আরো জানাল, 'মনে রাখবেন, চুক্তি মানেই হচ্ছে চুক্তি।' তাদের দুজনের মধ্যে অবশ্য কোন দানছত্রের ব্যাপার নেই। জোনাস বলল, 'আপনি যা বলবেন, তাই হবে।'

নতুন বন্দোবস্ত জোনাসের ভেতর সব সময়ের জন্য এক তৃপ্তিবোধ নিয়ে এল। এখন তার কাছে প্রচুর চিঠি আসে। ভদ্রতা করে সবগুলোরই উত্তর দেওয়া দরকার, সেই দরকার মেটানোর যথেষ্ট সময় এবার সে হাতে নিল। তার শিল্পচর্চার এটা-সেটা

BanglaBook.org

জানতে চেয়ে কিছু চিঠি আসত বটে, তবে বেশির ভাগ চিঠিতে পত্রকারদের নিজেদের কথাই থাকত, কেউ তার পেশার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাত, কেউ তার উপদেশ চাইত আবার কেউ কেউ চাইত আর্থিক সাহায্য। তার নাম সংবাদমাধ্যমে যত প্রকাশিত হতে লাগল, ততই জঘন্য জঘন্য সব অন্যায় অবিচারের রহস্য ফাঁস করে দেওয়ার কাজে অন্যান্যদের মত নেমে পড়ার জন্য আন্তরিকভাবে তাকে পীড়াপীড়ি করা হতে লাগল। জোনাস চিঠির উত্তর ঠিকঠাক দিত। শিল্প নিয়ে লেখালেখি করত। লোকজনকে ধন্যবাদ জানাত, উপদেশ দিত, স্বল্প পরিমাণে আর্থিক সাহায্য পাঠানোর জন্য নেকটাই না পরে ঘুরে বেড়াত, শেষে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া প্রতিবাদপত্রগুলোতেও সই করে দিতে লাগল। রাতো বলল, 'তুই কি এবার রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি শুরু করলি? ওসবের ভার লেখক মানুষ আর কুচ্ছিৎ বুড়িদের জন্য না হয় ছেড়ে দে।" যে সব প্রতিবাদপত্রে ফলাও করে জানানো থাকত যে তাদের সঙ্গে কোন বিশেষ দলের মতাদর্শের মিল নেই, সে অবশ্য শুধু সেগুলোতেই সই করত। সব প্রতিবাদই অপূর্ব এক স্বাধীনতা এনে দেওয়ার দাবি জানাত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ জোনাস একইসঙ্গে অবহেলা আর নতুন জীবনভরা চিঠিপত্র পকেটে ভরে ঘুরে বেড়াত। যেসব জরুরি চিঠি সাধারণত অচেনাদের কাছ থেকে আসে, সেগুলোর উত্তর সে লিখে পাঠিয়ে দিত। আর যেগুলো ধীরে সুস্থে ভেবেচিন্তে লিখতে হবে, অর্থাৎ বন্ধুদের পাঠানো চিঠিগুলো সে রেখে দিত আরেকটু সুন্দর সময়ে লিখবার জন্য। এইভাবে নানা কাজের দায়-দায়িত্ব এসে বাজেকাজে সময় কাটানো আর উড়ুউড়ু মন নিয়ে থাকবার চেয়ে শত হাত দূরে তাকে সরিয়ে রেখেছিল। কেবলই কেন যেন মনে হত, সে যেন পিছিয়ে পড়ছে, কি যেন এক দোষ করেছে, সময়ে সময়ে কাজ করতে গেলেও এই চিন্তা তার মাথায় ঘুরঘুর করত।

বাচ্চাকাচ্চাদের জন্য লুইজের অবস্থা আরো কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল, অন্য সময়ে যে কাজগুলো জোনাস বাড়িতেই করে ফেলতে পারত, এখন সেসবকিছু নিজে নিজে করতে গিয়ে লুইজের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। সেসব দেখে সে যন্ত্রণায় ভুগত। যাই হোক না কেন, নিজের কাজ তো সে মহানন্দে করে বেড়াচ্ছে। আর লুইজ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। লুইজ বাজার করতে বাড়ির বাইরে বেরোলে অবস্থাটা ভালভাবে টের পাওয়া যেত। বড় ছেলে যখনই 'ফোন এসেছে' বলে চেঁচাত, জোনাস ছবি ফেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটত, নতুন আরেকটা নেমন্তন্ন পেয়ে হাসি হাসি মুখে আবার ফিরে আসত। এরপর গ্যাসের লোক বাড়ির মিটার দেখতে এলে কোন বাচ্চা গিয়ে দরজা খুলত আর সেখান থেকেই লোকটি চেঁচিয়ে বলত, 'মিটার দেখব'। 'আসছি! আসছি।' তারপর জোনাস যখন টেলিফোন নামিয়ে বা দরজা খোলা রেখে ফিরে আসত তার পেছন পেছন কোন না কোন বন্ধু বা শিষ্য কখনো সখনো দুজনেই একসঙ্গে ছোট ঘরে অর্ধসমাপ্ত আড্ডা শেষ করতে ঢুকে পড়ত। ধীরে ধীরে মাঝের হলঘরটাই বারংবার দেখাসাক্ষাৎ করার জায়গা হয়ে গেল। সবাই এসে সেখানেই দাঁড়াত। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করত। একটু দূর থেকে জোনাসের মতামত জেনে

BanglaBook.org

নিত। কিংবা চট করে ছোট ঘরটায় এসে জড়ো হত। ছোট ঘরে ঢুকে আনন্দের চোটে বলে উঠত, 'যাক বাবা, এখানে কোন ঝুটঝামেলা ছাড়াই তোমাকে একটু অন্তত একটু দেখা যাবে।' কথাটা জোনাসের মন ছুঁয়ে যেত। সে বলত, 'ঠিক বলেছ। কখনোই আমরা নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের সুযোগটুকু পাই না।' বলতে বলতে টের পেত, যাদের সঙ্গে সে দেখা করতে পারছে না তাদের কতখানি হতাশ হতে হচ্ছে, সেই দুঃখে নিজে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। এদের মধ্যে বেশির ভাগই হল, সেইসব বন্ধুবান্ধব যাদের সে পছন্দ করে। কিন্তু হাতে সময় নেই, সব কিছু তো চাইলেই পাওয়া যায় না। এর ফলে খ্যাতির বিড়ম্বনা শুরু হল। লোকে বলতে লাগল, 'ওর দেমাক বড় বেড়ে গেছে। এখন তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তাই অন্যদের সঙ্গে দেখা করার আর দরকার নেই।' কেউ কেউ আবার বলত, 'নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ও ভালবাসে না।' না, তা নয়, রাতো, লুইজ, বাচ্চাদের ছাড়া আরো কাউকে কাউকে সে ভালবাসত, আর সবাইকেই সে পছন্দ করত। কিন্তু জীবন যে বড় ছোট, সময় বয়ে যায়, সেখানে নিজের শক্তি সামর্থ্যের একটা গন্ডি তো থাকবে। সারা বিশ্ব আর মানুষকে আঁকা আর একইসঙ্গে তাদের নিয়ে বসবাস করা খুব কঠিন। আবার আরেকদিকে, সে কোন অভিযোগ করতে পারত না। কিংবা নিজের পথের বাধাগুলোর ব্যাপারে গুছিয়ে বলতে পারত না। বলতে পারলে লোকেরা তখন তার পেছনে চাঁটি কষিয়ে বলত, 'ভাগ্যবান পুরুষ। এই হল বিখ্যাত হওয়ার মূল্য।'

এইভাবে চিঠিপত্র ডাঁই হয়ে জমতে লাগল, শিষ্যেরা তাকে কোনমতেই অধঃপাতে যেতে দিচ্ছিল না। সমাজের ওপরতলার লোকেরা চারপাশে ভিড় করছিল। এটা বলতেই হবে, ছবির প্রতি তাদের টান দেখে জোনাস প্রশংসা করত। ব্রিটিশ রাজপরিবার বা কোন ভোজনবিলাসী ভ্রমণ নিয়ে সবার যেমন উত্তেজনা ভরা আগ্রহ থাকে, সেই লোকগুলোরও কিন্তু তার ছবির প্রতি একইরকম আগ্রহ ছিল। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, তাদের বেশিরভাগই ছিল ওপরতলার মহিলা, আচার-ব্যবহারে তারা খুবই সহজ সরল, তারা নিজেরা কোন ছবি কিনত না। শিল্পীর সঙ্গে বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিত কেবল ভঙ্গুর এক আশাতে, তাদের বদলে বন্ধুবান্ধবেরা নিশ্চয়ই ছবি কিনবে। আরেক দিকে তারা লুইজকে চা পরিবেশন করার সময় আগ্রহভরে সাহায্য করত। কাপগুলো হাতে হাতে বিলি হত, রান্নাঘর থেকে হলঘর ঘুরে বড়ঘরে ঘুরতে যেত। তারপর আবার ছোট স্টুডিওতে বিশ্রাম নিতে আসত। সেখানে জোনাস ঘরভর্তি হয়ে-যাওয়া হাতে-গোনা কয়েকজন বন্ধু আর দর্শকদের মাঝখানে ছবি আঁকতে আঁকতে কৃতজ্ঞচিত্তে চায়ের কাপ নেওয়ার জন্য তুলি নামিয়ে রাখত, শুধুমাত্র তার জন্য কোন সুন্দরী সেই কাপে চা ঢেলে দিতেন।

চা খেতে খেতে সে হয়ত ইজেলে সবেমাত্র নামিয়ে-রাখা কোন শিষ্যের স্কেচের ওপর একটু চোখ বোলাত। বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করত, আবার কথা থামিয়ে রাত জেগে লেখা চিঠির গাদা ডাকে ফেলে দেওয়ার জন্য কাউকে অনুরোধ করত। পায়ের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়া দ্বিতীয় সন্তানটিকে কোলে তুলে নিত। ফটো তোলার জন্য

BanglaBook.org

বিশেষ ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়াত, 'ফোন এসেছে' শুনে উঁচু করে কাপ তুলে ধরে হলভর্তি একদঙ্গল লোকের ভেতর কেবল মাপ চাইতে চাইতে এগোত, তারপর আবার ফিরে এসে ফটোর এককোণে জায়গা নিয়ে দাঁড়াত, কোন সুন্দরীর কাছে তাঁর পোর্ট্রেট আঁকতে পারলে যারপরনাই নিজে যে ধন্য হবে এইটুকু বলতে একবার দাঁড়াত, আবার ইজেলের কাছে ফিরে আসত। কাজ শুরু করলেই 'জোনাস, একটা সই লাগবে।' 'রেজিস্টার্ড চিঠি এল নাকি?' 'না, কাশ্মিরের বন্দিদের জন্য।' 'আসছি, আসছি!' অভিযুক্তদের তরফ থেকে আসা যুবক বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করতে দরজার কাছে দৌড়ে যেত, প্রতিবাদের বিষয় মন দিয়ে শুনত। অল্প কথায় জানতে চাইত রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে নাকি, সে ব্যাপারে পুরো আশ্বস্ত হয়ে সই করত, শিল্পী হওয়ার সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করার যে কর্তব্য, সেই আশ্বাসও আরেকবার ঝালিয়ে নিত, আবার ফিরে আসত এখনকার কোন বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা বা বিদেশি মহান নাট্যকারের সঙ্গে দেখা করতে, তাঁদের নামধাম সে অবশ্য মনে রাখতে পারত না। বিদেশি নাট্যকার তার মুখোমুখি হয়ে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতেন। ফরাসী না জানার দরুণ নিজেকে যে আরো ভালোভাবে বোঝাতে পারছেন না সেই আবেগ চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলতেন। ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিতে ভেসে গিয়ে জোনাস শুধু মাথা নাড়াত। সৌভাগ্যক্রমে, সেই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে আচমকা উদ্ধার পেয়ে যেত তার সঙ্গে দেখা করতে-আসা একালের বিখ্যাত বাগ্মী ধর্মযাজকের আবির্ভাবে। জোনাস সত্যি সত্যি খুশি হয়ে বলত, দেখা করতে পেরে সে খুব খুশি হয়েছে, পকেটের ভেতর উত্তর না-দেওয়া চিঠির বান্ডিলটাকে টের পেত, তারপর ছবির একটা অংশ আঁকবার জন্য তুলি নিয়ে তৈরি হত। কিন্তু ঠিক তখনই একজোড়া ঝাঁকড়াচুলো কুকুর উপহার আনবার জন্য কাউকে ধন্যবাদ দিতে হত। ছোট শোওয়ার ঘরে দুটোকে নিয়ে গিয়ে আটকানো হত। উপহারদাত্রীর দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্নের প্রস্তাবে রাজি হত, সঙ্গে সঙ্গে আবার লুইজের ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটত, নিজের চোখে দেখবার আগেই কুকুর দুটো যে ঘরবাড়ি তছনছ করে ফেলেছে, সে ব্যাপারে তখন সে একেবারে নিঃসন্দেহ, এবার গিয়ে তাদের স্নানঘরে আটকে রাখত। সেখানে দুটোতে মিলে এমন নাছোড়বান্দার মত ডাকাডাকি করত যে অবশেষে কেউই আর কোন আওয়াজ শুনতে পেত না। প্রায় সর্বক্ষণ দর্শনার্থীদের মাথার ওপর দিয়ে লুইজের চোখ দেখতে পেত জোনাস, মনে হত সে দৃষ্টি যেন করুণ হয়ে উঠেছে। সবশেষে দিন ফুরিয়ে আসত, দর্শনার্থীরা বিদায় নিত। অন্যেরা বড় ঘরে একটু অপেক্ষা করত, লুইজ বাচ্চাদের কিভাবে বিছানায় শুইয়ে দেয় দেখতে দেখতে তারা ভাবাবেগে বিচলিত হয়ে উঠত, অতি বাধ্যভাবে এক মার্জিত, ভদ্রোচিত পোশাকের মহিলা লুইজকে সাহায্য করতেন, তিনি এই বলে গজগজ করতেন যে তাঁকে নিজের বিলাসবহুল বাড়িতে ফিরতে হবে। সেখানে দুটো তলা জুড়ে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু জোনাসদের এখানের চেয়ে সে জায়গা অনেক বেশি ফাঁকা আর সেখানে আদৌ এ বাড়ির মতো পরিবেশ নেই।

এক বিকালে রাতো দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে কাপড় শুকানোর একটা কল নিয়ে এল,

BanglaBook.org

রান্নাঘরের সিলিংয়ে স্ক্রু দিয়ে আটকে সেটা ব্যবহার করা যায়। রাতো এসে দেখতে পেল, সারা ফ্ল্যাট লোকে গমগম করছে। ছোট ঘরে শিল্পপ্রেমীদের মাঝখানে জোনাস এক মহিলার ছবি আঁকছে। সেই মহিলাটিই তাকে কুকুর উপহার দিয়েছিলেন, আর এক সরকারী শিল্পী খোদ জোনাসের ছবি আঁকায় ব্যস্ত। লুইজ জানাল, শিল্পীটি ছবি আঁকার জন্য সরকারের কাছ থেকে বরাত পেয়েছে। ছবির নাম হবে 'কর্মব্যস্ত শিল্পী'। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাতো কাজে ডুবে-থাকা বন্ধুকে দেখতে লাগল। এক শিল্পপ্রেমী রাতোকে কোনদিন দেখেনি বলে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ওঁকে দারুণ দেখতে লাগছে না?' রাতো কোন উত্তর দিল না। লোকটা বলে চলল, 'মনে হচ্ছে, আপনিও বোধহয় ছবি আঁকেন। আমিও নিজে আঁকি। সে যাকগে, তবে একটা কথা জেনে রাখুন, ওঁর অবস্থা এখন পড়তির দিকে।' রাতো বলল, 'এখনই?' 'হ্যাঁ, একেই বলে সাফল্য। সাফল্যকে কখনো আটকানো যায় না। উনি এখন শেষ।' 'উনি এখন পড়তির দিকে না একেবারে শেষ?' 'যে শিল্পী পড়তির দিকে, সে তো শেষ হয়েই গেছে। দেখুন না, ওঁর ভেতরে আর ছবি আঁকার মত কিচ্ছু নেই। এখন ওঁর ছবি আঁকা হচ্ছে মিউজিয়ামে টানাবার জন্য।'

অনেক পরে প্রায় মাঝরাতে, ঘরের ভেতর জোনাস চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, লুইজ আর রাতো নির্বাকভাবে বিছানার কোণায় বসেছিল। বাচ্চারা ঘুমোচ্ছিল। কুকুরগুলোকে অন্যখানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লুইজ সবেমাত্র হাতমুখ ধুয়ে এসেছে, জোনাস আর রাতো মিলে প্রচুর ডিশ ধোয়ামোছা করেছে। সেই ধকলে শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। ডাঁই-করা ডিশ দেখে রাতো জিজ্ঞাসা করেছিল, 'একটা ঝি রাখিসনি কেন?' অনেক দুঃখ নিয়ে জোনাস বলেছিল, 'তাকে আর কোথায় রাখব?' তারপর থেকেই সবাই চুপচাপ। হঠাৎ রাতো জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কি তুই সুখী?' জোনাস একটু হাসলেও মুখে চোখে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠল। 'হ্যাঁ, সবাই আমাকে কত ভালোবাসে।' রাতো বলল, 'মোটেই না। খেয়াল করে দেখ এদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল নয়।' 'কার কথা বলছিস?' 'কেন? উদাহরণ হিসেবে তোর আঁকিয়ে বন্ধুরাই তো রয়েছে।' 'আমি জানি। কিন্তু অনেক শিল্পী এরকমই হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার ব্যাপারে তারা ঠিক নিশ্চিত নয়। দেখা যাবে হয়ত সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পীরও একই মত। তাই ওরা প্রমাণ খোঁজে, বিচার করে আর শাস্তি দেয়। এটাই ওদের শক্তি জোগায়, এটাই বেঁচে থাকার শুরু। ওরা যে কত নিঃসঙ্গ।' রাতো শুধু মাথা নাড়ল। জোনাস বলল, 'আমার কথাটা মন দিয়ে শোন। আমি ওদের ভাল করে চিনি। তুইও ওদের ভাল না বেসে থাকতে পারবি না।' তখন রাতো বলল, 'আর তুই নিজে কি? তুই বেঁচে আছিস? কোনদিন কারো সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা তো বলিসনি!' জোনাস হাসতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রায়ই ওদের খারাপ দিকটার কথা চিন্তা করি, কিন্তু তারপর সব যে ভুলে যাই।' শেষে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু এটুকু জানি একদিন না একদিন আমি ঠিক বেঁচে থাকব।'

BanglaBook.org

রাতো এবার লুইজের মতামত জানতে চাইল। ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে লুইজ জোনাসের কথা সমর্থন করল, দর্শনার্থীদের মতামতের কোন গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। জোনাসের কাজটাই আসল ব্যাপার। লুইজ এটাও ভাল করে বোঝে যে তৃতীয় সন্তানটির জন্য কাজের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। আস্তে আস্তে বাচ্চাটা বড় হচ্ছে। শোয়াবসার জন্য এবার একটা খাট কিনতে হবে, সেটা আবার অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকবে। আরো বড় একটা ফ্ল্যাট না পাওয়া অবধি তারা কি করবে? জোনাস নিজেদের শোয়ার ঘরটার দিকে তাকাল। এটাকে এখন আর খুব একটা মানানসই বলে মনে হচ্ছে না। বিছানাটা অনেক চওড়া। ঘরটা অবশ্য সারাদিন ধরে ফাঁকা পড়ে থাকে। কথাটা লুইজকে বলার পরে সেও একটু ভাবল। শোওয়ার ঘরের জন্য জোনাসকে অন্তত বিব্রত হতে হবে না। লোকগুলো নিশ্চয় তাদের বিছানায় এসে শুয়ে পড়তে সাহস পাবে না। রাতোকে এবার লুইজ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি মনে হয়?' রাতো জোনাসের দিকে তাকাল। জোনাসের চোখ জানালার বাইরে। নক্ষত্রশূন্য আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে উঠে গিয়ে সে পর্দা টেনে দিল। ফিরে এসে রাতোর দিকে একটু হেসে নিঃশব্দে পাশে গিয়ে বসল। লুইজ আর থাকতে না পেরে এবার জানিয়ে দিল, সে গা ধুতে যাচ্ছে। দুই বন্ধু একা হয়ে যাওয়ার পর জোনাস টের পেল, তার কাঁধে রাতোর কাঁধ। সেদিকে না তাকিয়ে সে বলল, 'আমি আঁকতে ভালবাসি। সারা জীবন ধরে দিনরাত আমি কেবল এঁকে যেতে চাই। এটা কি আমার সৌভাগ্য নয়?' স্নেহভরে রাতো তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিশ্চয়, এটাই সৌভাগ্য।'

ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল, তাদের হাসিখুশি আর সুস্থ দেখতে পেয়ে জোনাস আনন্দ পেত। এখন তারা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল চারটে হয়ে যায়। শনি বা বৃহস্পতিবার বিকালে, মাঝে মাঝে টানা লম্বা ছুটির দিনগুলোতে তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে জোনাসের এখনও ভাল লাগে। এখনও তারা চুপচাপ খেলা করার মত বড় হয়নি। ঝগড়াঝাঁটি আর হৈ-হুল্লোড়ে সারা ফ্ল্যাট মাতিয়ে রাখবার মত ক্ষমতা এখনও তাদের আছে। তাদের চুপ করিয়ে রাখতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, কখনও সখনও মারধোর করার ভানও করতে হয়। তাছাড়া কাচাকুচির কাজ রয়েছে। বোতাম সেলাই ফোঁড়াই করতে হয়। লুইজ সব কিছু আর সামলাতে পারে না। ঝি-চাকর রাখবার মত জায়গা নেই। যেরকম গা জড়াজড়ি করে তারা দিন কাটায়, সেখানে এমনকি ঠিকে কাজের লোকও আনা যায় না, এই অবস্থায় জোনাস লুইজের বিধবা বোন রোজ আর তার মেয়ের সাহায্য নেওয়ার প্রস্তাব দিল। লুইজ বলল, 'হ্যাঁ, রোজের কাছে আমাদের কোন ঢাক গুড়গুড় ব্যাপার নেই। সেরকম দরকার হলে আমরা ওকে বাড়ির বাইরেও রাখতে পারি।' ঠিকঠাকমত সমস্যার সমাধান করতে পেরে জোনাস খুশি হয়ে উঠল, এবার লুইজ একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। স্ত্রীর খাটাখাটুনি দেখে নিজের বিবেক দংশনও এবার দূর হবে। বাড়তি লোকবল হিসাবে রোজ মেয়েকে প্রায়ই সঙ্গে করে আনত, সেজন্যে আরো বেশি স্বস্তি বেড়ে গেল। দুজনেই খাঁটি সোনার টুকরো, তাদের সৎ প্রকৃতির ভেতর ফুটে উঠত পবিত্রতা

BanglaBook.org

আর নিঃস্বার্থপরতা। লুইজদের সব দিক থেকে যথাসম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা তারা করত, নিতান্ত দায়ে পড়ে নয়, তাদের সব কাজে মেশানো থাকত ভালবাসা। দুজনের নিঃসঙ্গ জীবনের একঘেঁয়েমিও এইভাবে কিছুটা কেটে গিয়েছিল, তাছাড়া জোনাসদের খোলামেলা পরিবেশে থাকতে পারার আনন্দও তারা বেশ অনুভব করছিল। আগেই যা ভাবা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে নিজেদের মধ্যে কোন ঢাক গুড়গুড় ছিল না, এই দুই আত্মীয় প্রথম থেকেই একেবারে ঘরের লোক হয়ে গেল। বড় ঘরটাই একাধারে হয়ে উঠল আড্ডাখানা, খাওয়া ঘর, জামাকাপড় রাখার ঘর, আর বাচ্চাদের হৈ চৈ করার জায়গা। যে ছোট ঘরে তৃতীয় সন্তানটি ঘুমোত, সেটি হয়ে উঠল ছবির গুদাম ঘর, রোজ কোন কোনদিন মেয়েকে নিয়ে আসত না, সে সব দিন মাঝে মাঝে সে ঐ ঘরের ভাঁজ-করা খাটে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিত।

মূল শোয়ার ঘরটি ছিল জোনাসের দখলে। সেখানে বিছানা আর জানালার মাঝখানের জায়গাটুকুতে সে কাজ করত। সকালে বাচ্চাদের ঘরের পরে পরেই এই ঘরটি ঝেড়েঝুড়ে গোছানোর কাজ করা হত, তাকে শুধু সেই সময়টুকু অপেক্ষা করতে হত, তারপর আর কেউ বিরক্ত করতে আসত না। সারা ফ্ল্যাটের একমাত্র দেয়াল আলমারি সেই ঘরে থাকার সুবাদে শুধু মাঝে মাঝে চাদর বা তোয়ালে নিতে অন্যদের এখানে আসতে হত। ঢুঁ মারতে-আসা অতিথির সংখ্যা এখন একটু কমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের বদ অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। লুইজের আশা গুঁড়িয়ে দিয়ে বড় বিছানায় গা ঢেলে দিতে তারা একটুও ইতস্তত করত না। কেননা এইভাবেই জোনাসের সঙ্গে আরো আরাম করে আড্ডা মারা যায়। ছেলেমেয়েরা বাবার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য ঘরে ঢুকত, 'নতুন ছবি দেখাও'। জোনাস আধখানা আঁকা ছবিটা দেখিয়ে পরম মায়াভরে তাদের চুমু খেত। তারপর বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে বুঝতে পারত, কোন ফাঁকফোকর না রেখে সবাই মিলে তার বুকটাকে ভরিয়ে দিয়েছে। এদের না পেলে তাকে হয়ত কোন ফাঁপা নিঃসঙ্গতা গ্রাস করত। ছবির মতই ছেলেমেয়েরা তার প্রিয়পাত্র, সারা পৃথিবীতে এরাই একমাত্র জীবন্ত বিষয়।

ছবি আঁকার কাজ কমে আসছিল। কারণটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। এতদিন সে ছিল প্রচন্ড পরিশ্রমী। কিন্তু এখন, ছবি আঁকতে গেলেই অসুবিধা হচ্ছিল, এমনকি নিঃসঙ্গ মুহূর্তেও ছবি আঁকা যাচ্ছিল না। সেইসব মুহূর্তগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেটে যেত। চিরকালই সে অন্যমনস্ক। যখন তখন ভাবনাচিন্তার ঘোরে ডুবে যায়। কিন্তু এখন সে হয়ে উঠল পুরোপুরি স্বপ্নবিলাসী। ছবি নিয়ে ভাবত, নিজের কাজ নিয়ে ভাবত, শুধু ছবি আঁকতে পারত না। এখন সে মনে মনে বলত, 'আমি ছবি আঁকতে ভালবাসি,' দূরের রেডিও শুনতে শুনতে তখন তুলি-ধরা হাত শুধু গা ঘেঁষে ঝুলে থাকত।

একই সঙ্গে তার নামডাক কমে আসছিল। তাকে নিয়ে কিছু কিছু লেখার ভেতর সংযমের মাত্রা তখনো বজায় ছিল। কিন্তু বাদবাকিগুলো খোলাখুলিভাবেই বিরুদ্ধাচারণ করছিল, আর কিছু লেখাপত্র ছিল এমন জঘন্য যে মনে মনে সে বিপর্যস্ত

BanglaBook.org

বোধ করছিল। তবু মনে মনে বলছিল, এই সব আক্রমণেরও কিছু কিছু ভালো দিক নিশ্চয় আছে, সেই দিকগুলোই তাকে আরো ভাল কাজ করতে বাধ্য করাবে। তখনো যারা দেখা করতে আসত, তারা সেরকম খোলামেলা ব্যবহার করত, যেরকমভাবে পুরনো বন্ধুর কাছে নিজেকে গুটিয়ে রাখা যায় না। যখন সে কাজে ফিরে যেতে চাইত, তারা বলত, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাজ করে যাও। অনেক সময় আছে!' জোনাস বুঝতে পারছিল, কোন না কোনভাবে তারা নিজেদের ব্যর্থতার সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাচ্ছে। কিন্তু আরেকদিকে তাদের সঙ্গে এই নতুন ঐক্যকে সেলাম জানানোর ব্যাপারও ছিল। রাতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুই একটা আহাম্মক। ওরা তোকে পাত্তাই দেয় না।' জোনাস জবাব দিল, 'এখন ওরা আমাকে একটু ভালবাসে। এই অল্প ভালবাসাই সুন্দর। সেটা কিভাবে পাচ্ছি, তা কি খুব একটা ধর্তব্যের বিষয়?' তাই সে কথা বলে চলল, চিঠি লিখে চলল, যতখানি সম্ভব ছবি আঁকতে লাগল। মাঝেমধ্যে, বিশেষ করে রবিবারের বিকালে লুইজ আর রোজের সঙ্গে বাচ্চারা যখন বেড়াতে বেরোত, সত্যি সত্যি সে ছবি আঁকত, আঁকার কাজ যেটুকু এগিয়েছে, তা-ই সারা সন্ধেবেলা ধরে দেখতে দেখতে আনন্দ পেত। সেই সময় শুধু আকাশের ছবি সে আঁকছিল।

একদিন সেই ব্যবসায়ী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এসে জানাল, ছবি বিক্রির সংখ্যা প্রচুর কমে যাওয়ার জন্য তাকে মাসোহারার পরিমাণ কমাতে হচ্ছে। জোনাস রাজি হয়ে গেল কিন্তু লুইজের কপালে ভাঁজ পড়ল। মাসটা সেপ্টেম্বর। বাচ্চাদের স্কুলের সাজ-সরঞ্জাম কেনার সময়। পুরনো সাহসে মনকে শক্ত করে বেঁধে কাজে ডুবে গেল। রোজ সেলাই-ফোঁড়াই আর বোতাম লাগাতে জানলেও পোশাক বানাতে সে শেখেনি। তার স্বামীর ভাইঝি কাজটা জানে বলে লুইজকে সাহায্য করতে এল। জোনাসের ঘরে কোণের চেয়ারে বসে মহিলাটি কাজ করত, চুপচাপ নিশ্চলভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা কাজ করে যেত। এত নিশ্চল হয়ে থাকত যে লুইজ জোনাসের কাছে 'মেয়েদরজি' বিষয়ে আঁকবার কথা পাড়ল। জোনাস বলল, 'উত্তম প্রস্তাব।' সে উঠে পড়ে কাজে লাগল। দুটো ক্যানভাস নষ্ট করল। তারপর আধখানা-আঁকা আকাশের ছবি শেষ করতে আবার ফিরে গেল। পরদিন ঘরের ভেতর খানিকক্ষণ পায়চারি করল। ছবি না এঁকে নিজের ভাবনায় ডুবে রইল। এক উত্তেজিত শিষ্য তাকে এক বিশাল প্রবন্ধ পড়াবার জন্য ছুটে এল, না নিয়ে এলে লেখাটার কথা সে অবশ্য কোনদিন জানতে পারত না। লেখা পড়ে জানতে পারল, তার ছবিকে শুধু শুধুই অনেক বেশি দামি বলে মনে করা হয়। এগুলো এখন সেকেলে ছবি। সেই ব্যবসায়ী মাঝখানে ফোন করে আবার জানাল, বিক্রির হার আরো পড়ে যাওয়ার জন্য তার দুশ্চিন্তা আরো কতখানি বেড়ে গেছে। তবু সে স্বপ্ন আর ভাবনার ঘোরে বুঁদ হয়ে রইল। শিষ্যকে জানাল, প্রবন্ধটাতে কিছু সত্যি কথা আছে বটে কিন্তু সে নিজে আরো অনেক বছর ভালভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। ব্যবসায়ীকে জবাব দিল, সে নিজে তার দুশ্চিন্তার ভাগ না নিয়েও ব্যাপারটাকে ভালভাবে বুঝতে পারছে। সে একটা বড় কাজ, সত্যিকারের নতুন কাজ সৃষ্টি করতে চলেছে, আবার সব কিছু নতুন করে শুরু হবে।

BanglaBook.org

বলতে বলতে টের পাচ্ছিল, ভেতর থেকে সত্যি কথাই বেরিয়ে আসছে। ঐ তো তার শুভগ্রহ দেখা যাচ্ছে। শুধু একটা ভালরকম ব্যবস্থা চাই।

পর পর কয়েকটা দিন হলঘরে আঁকবার চেষ্টা করল। দুদিন বাদে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে স্নানঘরে, তার পরদিন রান্নাঘরে। এই প্রথম সব জায়গায় লোকদের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে বিরক্তি বোধ করল। এমন সব লোক, এখানে রয়েছে যাদের সে প্রায় চেনেই না। তাছাড়া এখানে রয়েছে পরিবারের আপন সব লোক যাদের সে ভালোবাসে। একটু সময়ের জন্য কাজ থামিয়ে ভাবতে বসল। আবহাওয়া প্রসন্ন থাকলে বাইরে গিয়ে নিসর্গের ছবি আঁকতে পারত। কপাল মন্দ, এখন সবে শীতের শুরু, বসন্তের আগে নিসর্গের ছবি আঁকা মুস্কিল। তবু বার কয়েক চেষ্টা করে হাল ছাড়তে বাধ্য হল। ঠান্ডায় হাড়মজ্জা জমে যাচ্ছিল। অনেকদিন শুধু ক্যানভাস নিয়ে কাটাল, বেশিরভাগ সময় তাদের পাশে হয় বসে থাকত নইলে জানালার সামনে সব রেখে দিত। আর সে ছবি আঁকে না। ভোরে ঘুরতে বেরোনোর অভ্যাস তৈরি হল। সারাদিন ধরে সে নিজেকেই কোন নকশার খুঁটিনাটি, কোন গাছ, বাঁকাত্যাড়া কোন বাড়ি, মানুষের মুখের পার্শ্বদৃশ্য আঁকার বরাত দিত। দিনের শেষে অবশ্য কিছুই আঁকত না। খবরের কাগজ, কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হওয়া, ঘুরে ঘুরে দোকান দেখা, কাফের উষ্ণতার মত ছোট ছোট লোভের ফাঁদ তাকে বিপথে নিয়ে যেত। প্রতি সন্ধ্যেবেলায় চিরসঙ্গী বদ বিবেকটার কাছে সুন্দর সুন্দর সব অজুহাত খাড়া করত। আপাতত এইটুকু সময় নাহোক নষ্ট হবে। এরপরে তো নিশ্চয়ই ছবি আঁকবে। আরো ভালো ভালো ছবি আঁকবে। আঁকার ইচ্ছেটা সবেমাত্র ভেতরে ভেতরে ফুটতে শুরু করেছে, ঐ কালো মেঘের পেছন থেকে শুভগ্রহ ধুয়েমুছে নতুনভাবে জ্বলজ্বল করতে করতে বেরিয়ে আসছে। এইসবের মাঝখানে কাফেতে যাওয়া তার কখনোই বন্ধ হয়নি। সারাদিন মনের মত কাজ করে যতটা ভাল লাগত, ঠিক ততখানি উল্লাস সে খুঁজে পেল অ্যালকোহলের ভেতর, যে স্নেহ আর মায়ামমতাভরে ছবির কথা ভাবত তেমন অনুভূতি ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কারো জন্য তখন হয়নি। দ্বিতীয় কইনাক গলায় ঢেলে খুঁজে পেল সেই তীব্র আবেগকে যা তাকে একইসঙ্গে সারা পৃথিবীর প্রভু ও ভৃত্য হিসেবে তৈরি করে দেয়। ফারাক একটাই, কোন কাজে না লাগিয়ে, নিজের হাতকে অলস করে রেখে এক শূন্যতার মাঝে সে এই আবেগকে উপভোগ করছে। তবু যে আনন্দের জন্য বেঁচে আছে, এই অবস্থাটা তারই কাছাকাছি, তাই এখন সে ধোঁয়া আর হৈ চৈ ভরা জায়গাগুলোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে স্বপ্ন দেখে কাটায়।

যে সব জায়গা আর গলিঘুঁজিতে শিল্পীরা প্রায়ই ঘুরে বেড়ায় সেদিকে অবশ্য সে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলত। চেনাশোনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে যখন তার ছবির কথা উঠত, ভয়ের চোটে সে আড়ষ্ট হয়ে যেত। বোঝা যেত, সে পালাতে চাইছে আর শেষমেশ পালিয়েই যেত। সে জানত, পেছনে কি বলাবলি হচ্ছে, 'ও নিজেকে রঁব্রঁ ভাবছে', শুনতে শুনতে অস্বস্তি বাড়ত। এখন কোন ব্যাপারে সে আর হাসে না, তা দেখে পুরনো বন্ধুরা এক বিশেষ অনিবার্য সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয়, 'হাসি বন্ধ করার

BanglaBook.org

একটাই কারণ। নিজেকে নিয়ে ও একেবারে তৃপ্ত।' কথাটা জেনে তার পালানোর প্রবৃত্তি আর অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। কোন কাফেতে ঢুকে কেবলই মনে হত, এই বুঝি কেউ চিনে ফেলল। ভেতরে সবকিছু আবার মেঘে ঢেকে গেল। শক্তিহীন হয়ে, অদ্ভুত দুঃখে ভরে গিয়ে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকত, তার রহস্যময় মুখে একইসঙ্গে লুকিয়ে থাকে অস্বস্তি আর আচমকা বন্ধুত্ব করার লোভ ও প্রয়োজন। তারপরেই মনে পড়ত রাতোর উৎফুল্ল দৃষ্টির কথা, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে যেত। এইভাবে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একদিন স্পষ্ট শুনল, কে যেন পাশের জনকে ডেকে বলছে, 'দেখো, লোকটার খোয়াড়িটা শুধু দেখো।'

এখন কেবল দূরে দূরে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে কেউ তাকে চেনে না। যেখানে ইচ্ছেমত কথা বলতে পারে, হাসতে পারে। সদিচ্ছাগুলো আবার ফিরে আসে, কেউ তো এখানে তার কাছে কিছু আশা করে না। এমন কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, যাদের খুশি করাটা খুব একটা কঠিন না। বিশেষ করে একজনের সঙ্গ ভাল লাগতে শুরু করে। যে স্টেশনে প্রায়ই সে যেত, লোকটি সেখানে খাবার পরিবেশনের কাজ করে। লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি কাজ করো?' জোনাস জবাব দেয়, 'রঙের কাজ'। 'ছবি রঙ করো না ঘরবাড়ি রঙ করো?' 'ছবি'। লোকটি বলে, 'বাঃ, এটা তো হেলাফেলার কাজ নয়।' কথাটা নিয়ে আর কোনদিন আলোচনা হয়নি। না, হেলাফেলার কাজ নয় বটে, কিন্তু যখনই সে কাজটাকে গুছিয়ে নিতে শিখবে, তখন সব কিছু আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

দিনের পর দিন গেল, গ্লাসের পর গ্লাস মদ ফুরোল। কতজনের সঙ্গে মোলাকাত হল, মেয়ের দল তাকে খুব সাহায্য করত। বিছানায় শোয়ার আগে বা পরে, সে তাদের সঙ্গে বেশ গল্প করত, বিশেষ করে একটু আধটু গর্বও করত। বিশ্বাস না করলেও তারা কিন্তু তাকে বেশ বুঝতে পারত। মাঝে মাঝে মনে হত, পুরনো শক্তি বোধহয় ফিরে আসছে। একদিন এক নর্মসঙ্গিণীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে সে মন তৈরি করে ফেলল। বাড়ি ফিরে এসে শোয়ার ঘরে আবার কাজ করার চেষ্টা করল। সেদিন সেই মহিলাদর্জি ছিল না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বৃথা কাটানোর পর ক্যানভাস তুলে রাখল। লুইজকে না দেখেই একটু হাসি হাসি মুখ করল। তারপর বেরিয়ে গেল। সারাদিন ধরে মদ গিলে সঙ্গিণীর সঙ্গে রাত কাটাল। মেয়েটির জন্য তখন অবশ্য শরীরে কামনাবাসনার জায়গাও ছিল না। সকালে লুইজের চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল যন্ত্রণাভরা অত্যাচারের ছাপ। লুইজ জানতে চাইল, মেয়েটিকে সে ভোগ করেছে নাকি। জোনাস বলল, মাতাল হওয়ার জন্য এটিকে করতে না পারলেও আগে অনেক মেয়েকেই সে ভোগ করেছে। এই প্রথম যেন তার হৃদয় ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেল, লুইজের মধ্যে আচমকা এক ডুবে-যাওয়া নারীর চেহারা, বিস্ময় আর চরম বেদনায় মাখামাখি সেই চেহারা। মনে পড়ল, এতদিন ধরে লুইজের কথা একবারও মাথায় আসেনি। লজ্জায় কুঁকড়ে গেল সে। বারংবার ক্ষমাভিক্ষা করল। সব কিছু একেবারে চুকেবুকে গেছে, পুরনো দিনগুলো যেমন ছিল আগামীকাল আবার সব কিছু

BanglaBook.org

সেরকমভাবে শুরু হবে। কথা বলতে না পেরে লুইজ চোখের জল লুকোনোর জন্য শুধু ঘুরে দাঁড়াল।

পরের দিন জোনাস ভোরবেলায় বেরিয়ে গেল। তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। প্রচুর তক্তা নিয়ে যখন বাড়ি ফিরল, তখন সে সপসপে ভিজে। দুজন পুরনো বন্ধু তার খোঁজ করতে এসে বড় ঘরে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। তারা বলল, 'জোনাস নিজের আঙ্গিক বদলাচ্ছে। এবার ও কাঠের ওপর আঁকবে।' জোনাস হেসে বলল, 'উহুঁ, আমি নতুন কিছু শুরু করতে চলেছি।' যে ছোট হলঘরের সঙ্গে স্নানঘর, শৌচালয় আর রান্নাঘরের যোগ রয়েছে, সেদিকে জোনাস চলল। দুটি হলঘর যেখানে সমকোণে মিশছে, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকার সিলিং অবধি উঁচু হয়ে-থাকা দেয়ালগুলোকে ভাল করে দেখল। একটা ধাপওলা মই দরকার, নিচে নেমে দারোয়ানের কাছ থেকে মই জোগাড় করে আবার ওপরে উঠে এল।

এতক্ষণে ফ্ল্যাটে আরো অনেক লোক এসে জুটেছে, সেইসব অতিথিরা তাকে ফিরে পেয়ে দারুণ খুশি, তাদের ভালবাসা আর নিজের পরিবারের প্রশ্ন এড়িয়ে হলের শেষমাথায় পৌঁছনোর জন্য তাকে বেশ বেগ পেতে হল। ঠিক তখনই রান্নাঘর থেকে স্ত্রী বেরিয়ে এল। মই নামিয়ে রেখে জোনাস তাকে জড়িয়ে ধরল। লুইজ বলল, 'দোহাই তোমার, এমন কাজ আর করো না।' 'না, না, আমি এখন আঁকতে যাচ্ছি। আমাকে আঁকতে হবেই।' নিজের মনে সে কথাগুলো বলল, মনে হচ্ছিল যেন অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে। চটপট কাজে নেমে পড়ল। দেয়ালের মাঝ বরাবর তক্তা দিয়ে একটা মেঝে বানাতে লাগল। যাতে সরু হলেও উঁচু, লম্বা একটা চিলেকোঠা তৈরি করা যায়। পড়ন্ত বিকেলের মধ্যে কাজ শেষ। মইয়ের সাহায্যে জোনাস চিলেকোঠার মেঝেটাকে দেয়ালের মাঝখানে আটকে দিয়ে জিনিসটা শক্তপোক্ত হয়েছে কিনা বারবার ঠুকে ঠুকে দেখল, তারপর সবার সঙ্গে মিশে গেল। সবাই আবার তাকে পুরনো বন্ধু হিসাবে পেয়ে খুশি। সন্ধ্যাবেলায়, ফ্ল্যাট যখন কিছুটা ফাঁকা হয়েছে, সে একটা তেলের কুপি, চেয়ার, টুল আর ফ্রেম জোগাড় করে ফেলল। তারপর তিন মহিলা আর বাচ্চাদের হতভম্ব দৃষ্টির সামনে সে সব নিয়ে চিলেকোঠায় উঠে গেল। ঝুলন্ত চিলেকোঠা থেকে গলা ভেসে এল, 'এখন আমি কারোর অসুবিধা না করে নিজের মত কাজ করতে পারব।' লুইজ জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে কিনা। 'নিশ্চয়ই। আমার বেশি জায়গার দরকার নেই। আমি আরো স্বাধীন হয়ে থাকব। কত বড় বড় শিল্পী মোমের আলোয় ছবি এঁকেছেন আর...' 'মেঝেটা ভালমত শক্ত হয়েছে?' নিশ্চয়ই। 'চিন্তা করো না। এটাই সব থেকে ভাল উপায়।' জোনাস নেমে এল।

পরের দিন খুব ভোরবেলায় সে চিলেকোঠায় উঠে বসল। ফ্রেমটাকে টুলে বসিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল। তারপর কুপি না জ্বালিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রান্নাঘর নয়ত শৌচালয় থেকে কেবল সরাসরি আওয়াজ আসছিল, অন্য আওয়াজগুলো অনেক দূরের মনে হচ্ছিল। দেখাসাক্ষাৎ, দরজার ঘণ্টার শব্দ, ফোনের

BanglaBook.org

শব্দ, আসা-যাওয়া, কথাবার্তা সবকিছু যেন আধখানা চাপা অবস্থায় এসে পৌঁছচ্ছিল, সেসব যেন বাইরের রাস্তা বা দূরের প্রাঙ্গণ থেকে ভেসে আসছে। তাছাড়া সারা ফ্ল্যাট যেখানে চোখ ঝলসানো আলোতে ভরে গেছে, তখন এখানে অন্ধকার বিশ্রামে মগ্ন। মাঝেমধ্যে কোন না কোন বন্ধু এসে চিলেকোঠার নিচে দাঁড়াচ্ছে। 'জোনাস, ওপরে কি করছ হে?' 'কাজ করছি।' 'আলো লাগবে না?' 'লাগবে, কিছুক্ষণের জন্য'। আঁকছিল না, সে কেবল ভাবছিল। এই অন্ধকার আর আধো নীরবতা, যা কিছু সে এতদিন জানত, ঠিক তার উলটো, মনে হচ্ছিল এখানে যেন মরুভূমি বা সমাধির নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। নিজের হৃদয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। যে সব শব্দ এখানে এসে পৌঁছচ্ছে এমনকি তাকে উদ্দেশ্য করে যে শব্দগুলো ভেসে আসছে, সে সব যেন আর তার জন্য নয়। সে যেন সেইসব মানুষদের মত হয়ে উঠেছে যারা বাড়িতে ঘুমের ভেতর মারা যায় আর সকালে অসুস্থ একঘেঁয়ে শব্দে ধু ধু ফাঁকা বাড়িতে চিরবধির এক শরীরের সামনে ফোন বেজে যায়। কিন্তু সে নিজে তো বেঁচে আছে, নিজের ভেতরের নিস্তব্ধতাকে শুনতে পাচ্ছে, এখানে লুকিয়ে-থাকা ভাগ্যবিধাতার জন্য অপেক্ষা করছে। এখনই সেই সৌভাগ্য জেগে উঠতে তৈরি হচ্ছে। তার কোন বদল হয়নি, আর হবেও না, এইসব এলোমেলো ফাঁকা দিনগুলোর ওপর অবশেষে ফেটে পড়তে চলেছে সেই শুভগ্রহ। 'আরো আলো দাও, আরো আলো দাও', সে বলতে থাকে, 'আমাকে তোমার আলো থেকে বঞ্চিত কোরো না।' সে ঠিক জানে, ভাগ্যবিধাতা আলো ছড়াবেই। কিন্তু তার আগে নিজেকে আরো গভীর ধ্যানে ডুবে যেতে হবে। পরিবারের থেকে আলাদা না হয়েও তাকে একা হওয়ার সুযোগ অবশেষে দেওয়া হয়েছে। এখনো তাকে আবিষ্কার করতে হবে যা কিছু সে স্পষ্ট করে বোঝেনি। যদিও সেসব অতীতে ভাল করে জানত আর যেন জানত বলেই সব সময় আঁকত। অবশেষে আঁকড়ে ধরতে হবে সেই রহস্যকে যাকে সে এখন বুঝতে পারছে কেবল শিল্পের রহস্য নয়, আরো অন্য কিছু হিসেবে এখন তাই সে আর কুপি না জ্বালিয়ে অন্ধকারে বসে রইল।

প্রতিদিন জোনাস সকাল-সকাল চিলেকোঠায় উঠে যেত। অতিথিদের সংখ্যা কমতে লাগল। অন্যমনস্ক লুইজ এখন আর কোন কথাবার্তায় ভাল করে মনোযোগ দিতে পারে না। শুধু খাওয়ার সময় জোনাস নিচে নামত। বাদবাকি সময় নিজের খাঁচায় ঢুকে সময় কাটাত। অন্ধকারে সারাদিন ধরে নিথরভাবে বসে থাকত। রাতে স্ত্রীর কাছে বিছানায় ফিরে যেত। দিন কয়েক বাদে লুইজকে সে কাগজে মুড়ে খাবার দিয়ে দিতে বলল, এমন যন্ত্রণা নিয়ে সে হাতে হাতে খাবারটা দিয়ে দিল যে জোনাসের বুক উথাল-পাথাল করে উঠল। কারণে অকারণে তাকে বিরক্ত করতে না চেয়ে জোনাস তখন তাকে এমন কিছু খাবার বানিয়ে দিতে বলল যা চিলেকোঠায় কয়েক দিনের জন্য জমিয়ে রাখা যায়। এইভাবে, একটু একটু করে, সারাদিন বার বার ওঠানামার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। তারপরেও জমানো খাবারদাবারে হাত প্রায় পড়তই না।

এক সন্ধেবেলায় লুইজকে ডেকে কয়েকটা কম্বল সে চাইল, 'আজকের রাতটা

BanglaBook.org

এখানেই কাটাব।' ঘাড় উঁচু করে লুইজ তাকিয়ে থাকল। কিছু বলার জন্য মুখ খুলল, তারপর চুপ করে গেল। তার মুখে দুশ্চিন্তা আর বেদনার ছাপ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে শুধু নিজের স্বামীকে দেখছিল। জোনাস হঠাৎ খেয়াল করল, কত বুড়িয়ে গেছে লুইজ, জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত তার ওপরেও কত গভীর ছাপ ফেলেছে। সত্যিই তো, কখনও সে নিজে কুটোগাছটি নাড়তেও সাহায্য করেনি। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা বলার আগেই পরম মায়াভরে তাকিয়ে লুইজ এমনভাবে হাসল যে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। লুইজ বলল, 'তুমি যা বলছ, তাই হবে সোনা আমার।'

সেই থেকে সব রাত্রি চিলেকোঠাতেই কাটে, নিচে আর নামতেই হয় না প্রায়। জোনাসকে সারা দিনরাত একবারও দেখতে না পেয়ে ফ্ল্যাটে অতিথিদের আনাগোনা একদম বন্ধ হয়ে গেল। কাউকে কাউকে বলা হল, জোনাস গ্রামে রয়েছে, যাদের কাছে মিথ্যা কথা বলাটা মুস্কিল তাদের বলা হল, সে একটা স্টুডিও খুঁজে পেয়েছে। বিশ্বস্ত রাতো শুধু একা আসত। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠে বড় ঝাঁকড়া মাথাটা বন্ধুর মত চিলেকোঠার মেঝেতে গলিয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'কেমন চলছে?' 'দারুণ।' 'কোন কাজ করছ?' 'করে তো যাচ্ছি।' 'কিন্তু কোন ক্যানভাস নেই তো।' 'কাজটা করা নিয়েই কথা।' মই থেকে চিলেকোঠা অবধি এইভাবে কথাবার্তা চালানো যায় না। রাতো মাথা নাড়তে নাড়তে আবার নেমে আসত, ইলেকট্রিকের ফিউজ বদলাতে নয়ত তালা মেরামত করতে লুইজকে সাহায্য করত, তারপর মইয়ে না উঠে জোনাসকে শুভরাত্রি বলে বিদায় নিত, অন্ধকার থেকে উত্তর ভেসে আসত, 'আবার দেখা হবে বন্ধু।' একদিন জোনাস শুভরাত্রি বলার সঙ্গে ধন্যবাদও জুড়ে দিল। 'আবার ধন্যবাদ কেন?' 'তুই আমাকে ভালবাসিস বলে।' 'হ্যাঁ, এটা একটা সত্যিকারের খবর।' বলতে বলতে রাতো বেরিয়ে গেল।

আরেক সন্ধ্যায়, রাতোকে ডাকতেই সে ছুটে এল। এই প্রথম চিলেকোঠায় কুপির আলো জ্বলছিল। চিন্তিত মুখে জোনাস চিলেকোঠার বাইরে ঝুঁকে রয়েছিল। 'একটা ক্যানভাস এনে দে।' 'আগে বল, তোর কি হয়েছে? এত রোগা হয়ে গেছিস, ভূতের মত দেখতে লাগছে।' 'গত দুদিনে বলতে গেলে, প্রায় কিছুই খাই নি, ওটা কোন ব্যাপার না। আমাকে কাজ করতে হবেই,' 'আগে খেয়ে নে।' 'উঁহুঁ, খিদে নেই।' রাতো ক্যানভাস এনে দিল। চিলেকোঠার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে জোনাস প্রশ্ন করল, 'ওরা কেমন আছে?' 'কারা?' 'লুইজ আর বাচ্চারা।' 'ওরা ঠিক আছে। ওদের সঙ্গে তুই থাকলে আরো ভাল থাকত।' 'এখনো আমি ওদের সঙ্গে আছি। বলে দে, সব সময় আমি ওদের সঙ্গে আছি।' এরপর আর তাকে দেখা গেল না। রাতো লুইজকে নিজের দুশ্চিন্তার কথা খুলে বলল। লুইজ স্বীকার করল, সে-ও অনেকদিন ধরে অমঙ্গলের চিন্তায় জেরবার হয়ে উঠেছে। 'আমরা আর কি করতে পারি? আমি নিজে যদি ওর জায়গায় কাজ করতে পারতাম।' রাতোর দিকে তাকিয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল লুইজ। 'ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না।' তাকে দেখে পুরনো দিনের সেই তরুণীর কথা

BanglaBook.org

মনে পড়ছিল। দেখতে দেখতে রাতো অবাক হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ বুঝতে পারল, লুইজের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

সেদিন রাত থেকে পরদিন সকাল অবধি কুপি জ্বলছিল। রাতো বা লুইজের মধ্যে যে কেউ এলেই জোনাস শুধু বলে যাচ্ছিল, 'ও কিছু নয়। আমি কাজ করছি।' দুপুরে কিছু কেরোসিন চেয়ে পাঠাল। ধোঁয়া ওঠা কুপি আবার সন্ধে অবধি ঝলমল করে জ্বলতে লাগল। লুইজ আর বাচ্চাদের সঙ্গে রাতের খাবার খেতে রাতো রয়ে গেল। তারপর মাঝরাতে জোনাসকে শুভরাত্রি বলার জন্য এগোল। আলোয় ভরা চিলেকোঠার নিচে একটু দাঁড়িয়ে শেষমেশ কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। পরদিন সকালে লুইজ জেগে উঠবার পরেও আলোটা জ্বলছিল।

বাইরে এক চমৎকার দিন শুরু হয়েছে, জোনাস তার কিছুই টের পাচ্ছে না। দেয়ালে ক্যানভাসটা হেলিয়ে রেখেছে। ক্লান্তভাবে হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে বসে অপেক্ষা করছে। নিজের মনে বলে চলেছে, এরপর থেকে আর কখনো সে কাজ করবে না। এখন সে তৃপ্ত। শুনতে পাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা গজগজ করছে, জল পড়ার শব্দ হচ্ছে, খাবারের ডিশে টুংটাং শব্দ উঠছে। লুইজ কথা বলছে। রাজপথ কাঁপিয়ে ট্রাক চলে গেলে বিশাল বিশাল জানালা ঝনঝন করে উঠল। পৃথিবী এখনো রয়েছে নবীন আর ভালবাসায় ভরা। মানুষের সাদর সম্ভাষণের গুঞ্জন উঠে আসছে, জোনাস শুনতে লাগল। এতদূর থেকে তার ভেতরের আনন্দভরা শক্তি, তার শিল্পের বিরুদ্ধে আজ সে সব ধাবিত হচ্ছে না, চিরকাল নীরব-থাকা এই চিন্তাগুলোকে ঠিকমত প্রকাশ করা যাচ্ছে না, কিন্তু তারাই তাকে সবকিছুর উর্ধ্বে, খোলামেলা সতেজ বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চারা ফ্ল্যাটে দৌড়োদৌড়ি করছে, ছোট্ট মেয়েটা হাসছে, তার সঙ্গে সঙ্গে লুইজও হাসছে, কতদিন ওকে হাসতে সে দেখেনি। এদের সবাইকে সে ভালোবাসে। মনে প্রাণে ভালবাসে। কুপি নিভিয়ে দিতেই আচমকা অন্ধকার আবার নেমে এল। অন্ধকারে ঐ আবার ফিরে এল। ঐ তো তার শুভগ্রহ এখনো জ্বলজ্বল করছে। এই সেই গ্রহ, কৃতজ্ঞচিত্তে চিনতে পেরেছে এবার। কোন শব্দ না করে যখন সে নিচে পড়ে গেল, তখনো সে একদৃষ্টিতে নিজের শুভগ্রহের দিকে তাকিয়ে ছিল।

ডাক্তার ডেকে আনার পরে সব দেখেশুনে তিনি জানালেন, 'এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। ভদ্রলোক বড় বেশি পরিশ্রম করছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে নিজের পায়ে খাড়া হয়ে যাবেন।' বেদনায় কুঁচকে-যাওয়া মুখে লুইজ প্রশ্ন করল, 'সত্যি বলছেন তো? ও ঠিক হয়ে যাবে?' 'হ্যাঁ, সেরে উঠবেন।' অন্য ঘরে রাতো একেবারে ফাঁকা ক্যানভাসটিকে দেখছিল, ঠিক মাঝখানে একেবারে খুদে খুদে অক্ষরে জোনাস একটা শব্দ লিখে রেখেছে, কোনরকমে সেটাকে পড়া যায়, কিন্তু কিছুতেই জোর দিয়ে বলা যায় না, শব্দটা 'এক' না 'একতা'

ফরাসী থেকে ভাষান্তর : পার্থ গুহবক্সী

BanglaBook.org

উদ্ভিন্ন প্রস্তর

লাল বেলে মাটির কাঁচা এবং অধুনা কর্দমাক্ত—পথে গাড়িটা বেসামালভাবে এক মোড় ঘুরল। হেডলাইটের আলোয় এই রাতে, সহসাই, প্রথমে রাস্তার একপাশে ও পরে অপরপাশে টিনের চাল দেওয়া দুটি কাঠের কুটির ফুটে উঠল। ডানদিকে, দ্বিতীয় কুটিরের কাছে, ঝাপসা কুয়াশায় দেখা যাচ্ছিল অমসৃণ কাঠের বল্লার তৈরী এক মাস্তুল। মাস্তুলের চুড়ো থেকে বেরিয়ে এসেছে এক লোহার কাছি। যেখানে কাছিটা চুড়োয় আটকানো ছিল সে জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু নদীর পাড়ের বাঁধ, যেখানে এই কাঁচা রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে, তার আড়ালে হারিয়ে যাবার আগে গাড়ীর আলোয় কাছির ঢালু অংশের কোনো কোনো জায়গা ঝিক্‌মিক্ করে উঠছিল। গাড়ি গতি কমিয়ে দিয়ে কুটিরগুলির কয়েক মিটারের মধ্যে এসে থামল।

চালকের ডান দিক থেকে যে মানুষটি বার হলেন বেশ কষ্ট করতে হল তাঁকে দরজা দিয়ে বেরোতে। ওঁর মোটাসোটা বিশাল শরীরটা একটু দুলে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল। গাড়ির কাছে, অন্ধকারে, ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীরটি নিয়ে, মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, উনি সম্ভবত গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলেন কিছুক্ষণ। পরে উনি বাঁধের দিকে এগিয়ে, গাড়ির হেডলাইটের আলোর বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বাঁধের উঁচু জায়গাটায় গিয়ে উনি থামলেন, ওঁর বিশাল পিঠের আকৃতি রাতের আঁধারে ফুটে উঠল। কিছু পরে উনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ড্যাশবোর্ডের আলোয় ড্রাইভারের কালো হাসি মুখটি দেখা যাচ্ছিল। মানুষটি সংকেত দিতে ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে ই এক বিশাল শীতল নীরবতা এই জঙ্গলের উপর, এই মেঠো পথের উপর নেমে এল। আর তখনই জলের শব্দ শোনা গেল।

নিচে নদীর দিকে তাকালেন মানুষটি। শুধু এক বিশাল গতিময় অন্ধকার। এখানে সেখানে ঝিকমিকিয়ে উঠছে। দূরে এক জমে যাওয়া ঘনতর অন্ধকার দেখা যাচ্ছিল, সেটাই নদীর অপর পাড় হবে। তবে ভাল করে লক্ষ করলে ঐ নিশ্চল অপর পাড়ে দূর থেকে দেখা যায় তেলের প্রদীপের মতো একটা হলদেটে আলো। বিশাল মানুষটি গাড়ির দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন। চালক আলোগুলি নিভিয়ে দিল, আবার জ্বালল এবং এই রকম সে করতেই থাকল। বাঁধের উপরে মানুষটি অন্ধকারে অদৃশ্য হচ্ছিলেন আবার আলোয় দৃশ্যমান হচ্ছিলেন এবং প্রতিবারই আলো জ্বলার পর তাঁকে আরও বড়, আরও লম্বা দেখাচ্ছিল। হঠাৎ নদীর অপর পাড়ে এক অদৃশ্য হাতের প্রান্তে একটি লণ্ঠন কয়েকবার ওঠানামা করল। সংকেতকারীর শেষ সংকেতের পর ড্রাইভার শেষবারের

BanglaBook.org

মতো হেডলাইট নেভালো। গাড়ীটি এবং বিশাল মানুষটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আলো নিভে যাওয়ায় নদীটি প্রায় দৃশ্যমান হয়ে উঠল, অথবা অন্তত, তার কোনো দীর্ঘ তরল পেশী মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। রাস্তার দুই পাশে জঙ্গলের কালো ঘনীভূত আঁধার আকাশের প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছিল আর মনে হচ্ছিল সব যেন অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। ঘণ্টাখানেক আগের কাঁচা পথকে ধুয়ে দিয়ে যাওয়া ঝিরঝিরে বৃষ্টি এখনো এই গরম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল আর আদিম অরণ্যানীর মাঝে এই বিশাল উন্মুক্ত পরিসরটির নিশ্চলতা ও নীরবতাকে আরও গভীর করে তুলেছিল। কালো আকাশে ঝাপসা তারাগুলি কাঁপছিল।

নদীর অপর পাড় থেকে শিকলের আওয়াজ আর জলের ছপছপানির চাপা শব্দ শোনা গেল। অপেক্ষমান মানুষটির ডানদিকে কুটিরটির উপর লোহার কাছিটি টানটান হয়ে উঠল। একটা অস্ফুট ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ কাছিটার মধ্যে চলাচল করতে শুরু করল আর এই সঙ্গেই জলের মধ্যে এক আলোড়ন শোনা গেল, মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। ক্যাঁচকোঁচ শব্দটা ক্রমাগত নিয়মিত হয়ে উঠল, জলের শব্দ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠল ও একটু পরে বোঝা গেল ঠিক কোথা থেকে শব্দটা আসছে, আর সেখানকার লণ্ঠনটা ক্রমশ বড়ো হতে থাকল। লণ্ঠনের চারিদিকের হলদেটে আলোর এক জ্যোতির্মণ্ডল এখন পরিষ্কার দেখা গেল। এই জ্যোতির্মণ্ডল আস্তে আস্তে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হচ্ছিল আর এই সময়ে লণ্ঠনের আলোয় ও নিচে এবং চারপাশে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আলোকিত হয়ে উঠল চারকোণায় মোটা বাঁশের উপর দাঁড়ানো শুকনো তালপাতার চৌকোণা এক ছাউনি। এই সাদামাটা একচালাটা, যার চারিদিকে কতকগুলি অস্পষ্ট ছায়া ঘুরছিল, ধীরে নিকটের তীরের দিকে এগিয়ে আসছিল। যখন এটি নদীর প্রায় মাঝামাঝি, তখন কৃষ্ণাভ বর্ণের তিনজন খর্বকায় মানুষের চেহারা হলুদ আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল। এদের ঊর্ধাঙ্গ নগ্ন, মাথায় টোকা। অন্ধকারে জলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল নদীর প্রচণ্ড অদৃশ্য স্রোতে ধাক্কা খাওয়া একটি বড়ো বডৌল ফেরি নৌকো। আর এই ধাক্কা থেকে নিজেদের সামাল দেবার জন্য ওরা স্থির হয়ে পা দুটো একটু ফাঁক করে শরীরগুলি একটু ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নৌকোটি আরও কাছে আসতে মানুষটি একচালাটার পেছনে নৌকোর গলুই-এর কাছে দুই বিশাল নিগ্রোকে দেখতে পেলেন। এদের মাথায় বড়ো শনের টুপি, পরনে শুধুই ছাই রঙের সুতির প্যান্ট। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওরা দু'জনে প্রাণপণে লগি ঠেলছিল, জলের মধ্যে আস্তে আস্তে লগিগুলি ডুবিয়ে দিয়ে আর নৌকাটার পিছন দিক পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়ে। ভারসাম্য বজায় রেখে যতটা ঝোঁকা সম্ভব ততোটা ঝুঁকে ওরা লগি ঠেলছিল। সামনের মিউলাটো তিনজন নীরবে নিশ্চল দাঁড়িয়ে, অপেক্ষমান মানুষটির দিকে একবারও চোখ না তুলে, ক্রমাগ্রবর্তী তীরভূমির দিকে তাকিয়ে ছিল।

ফেরিনৌকোটি হঠাৎ একটি জেটির গায়ে ধাক্কা খেল। ধাক্কায় লণ্ঠনটা দুলে উঠল আর সেই আলোয়, তীর থেকে জলের মধ্যে ঢুকে পড়া জেটির প্রান্তটি নজরে পড়ল।

BanglaBook.org

লম্বা নিগ্রোগুলি নিশ্চল দাঁড়িয়ে, হাতগুলি মাথার ওপরে, শক্ত মুঠিতে লগিগুলির প্রান্ত ধরে আছে। লগিগুলি নদীতল পর্যন্ত প্রসারিত। আর নদীর স্রোতের সঙ্গে তাল দিয়েই বুঝিবা, নিগ্রোদের টানটান পেশীগুলিতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। অন্য মাল্লারা জেটির খুঁটিগুলির উপর চেন ছুঁড়ে দিয়ে নিজেরা জেটিতে লাফিয়ে পড়ল ও একটা কাঠের তক্তা নৌকো থেকে জেটি পর্যন্ত ফেলে দিয়ে একটা সাদামাটা ঢালু পাটাতন তৈরী করে দিল।

মানুষটি গাড়ীর কাছে ফিরে ভিতরে গিয়ে বসলেন আর ড্রাইভার গাড়ী স্টার্ট দিল। গাড়ীটি ঢালু পাড় ধরে আস্তে আস্তে উপরে উঠল, বনেটটা প্রথমে আকাশের দিকে মুখ করে ও পরে ঢাল বেয়ে নিচে নদীর দিকে নামল। গাড়ীটা ব্রেক চেপে মাঝে মাঝে কাদায় পিছলে আস্তে থেমে থেমে জেটির কাঠগুলির উপর মড়মড় শব্দে উঠে অপর প্রান্তে ফেরির দিকে এগোল। মিউলাটোরা সার বেঁধে দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ীটা ঢালু পাটাতনের উপর দিয়ে ফেরি নৌকোর ওপর আস্তে এগোল। গাড়ীর সামনের চাকাগুলি ফেরিতে নামতেই ফেরিনৌকোটা নিচে নেমে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ই দুলুনি সামলে পুরো গাড়িটার ভর নিয়ে নিল। ড্রাইভার গাড়িটাকে, আরও এগিয়ে একচালাটার সামনে যেখানে লণ্ঠনটা ঝুলছিল সেই পর্যন্ত নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিউলাটো কজন কাঠের তক্তাটা ফেরির উপর তুলে নিল আর লাফিয়ে নৌকোর উপর উঠে এসে কর্দমাক্ত নদীতীর থেকে নৌকোটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। নৌকোর তলায় নদীর ঢেউ-এর ধাক্কা নৌকোটিকে ভাসিয়ে রাখছিল আর নৌকোর উপরে লাগানো এক লম্বা দন্ডের অপর প্রান্ত কাছির উপরে চলমান হয়ে নৌকোটিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকল। লম্বা নিগ্রো দু'জন ওদের লগিগুলি তুলে নিয়ে ওদের কাজ বন্ধ করল। বিশাল মানুষটি ও চালক গাড়ি থেকে বেরিয়ে নৌকোর ধারে রেলিং-এর কাছে এসে, স্রোতের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। যতক্ষণ এই সব কাজ হচ্ছিল কেউই কোনো কথা বলেনি, এখনও যে যার জায়গায় নীরবে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু একজন লম্বা নিগ্রো একটা খসখসে কাগজে সিগারেট পাকাচ্ছিল।

এই বিশাল ব্রেজিল অরণ্যের যে ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে নদীটা বেরিয়ে ওঁদের দিকে এগিয়ে আসছিল, লোকটি সেই দিকে তাকিয়ে। এখানে নদীটি কয়েকশ মিটার চওড়া। আন্দোলিত রেশমি জলরাশি নৌকাটির পাশে ধাক্কা খাচ্ছে ও পরে দুই ধারে খালি জায়গা দিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়ে আবার এক সম্মিলিত প্রবল জলরাশি হয়ে এই অন্ধকার অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে শান্তভাবে রাত্রি ও সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এক অস্পষ্ট গন্ধ আসছে—জল থেকে অথবা জলকণা ভরা আকাশ থেকে — বাতাসে সেই গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। এখন ফেরিনৌকোর নিচে জলের ভারী ছপাৎ ছপাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে আর নদীর দুই তীর থেকে মাঝে মাঝে কোলা ব্যাঙের বা অচেনা পাখীদের ডাক শোনা যাচ্ছে। বিশাল মানুষটি ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ছোটোখাটো কৃশকায় ড্রাইভারটি এক বাঁশের খুঁটির গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ওর

BanglaBook.org

হাত দুটি ওর ওভারলের পকেটে। ওভারলটি এক সময়ে নীল ছিল কিন্তু এখন সারাদিনের জমা হওয়া লাল ধুলোয় আবৃত। ওর মুখে এক হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বয়সে যুবক হওয়া সত্ত্বেও বলিরেখায় কুঞ্চিত সে মুখ। ভিজে আকাশে ভেসে বেড়ানো মিটমিটে তারাগুলির দিকে তার দৃষ্টি। কিন্তু আসলে সে কিছুই দেখছিল না।

পাখীদের চিৎকার তীক্ষ্ণতর হল, সঙ্গে শোনা গেল কিছু অচেনা কিচির মিচির শব্দ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপরের কাছিটিতে ক্যাঁচকোচ আওয়াজ শুরু হল। দীর্ঘকায় নিগ্রো দুটি তাদের লগিগুলি জলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধের মতো তলদেশ হাতড়াতে লাগল। বিশাল মানুষটি ছেড়ে আসা তীরের দিকে ফিরে তাকালেন। সে তীর এখন কালো জল ও রাত্রির অন্ধকারে আবৃত। এই জলরাশি—হাজার হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অগণিত বৃক্ষরাজির যে মহাদেশ, তার মতোই—বিশাল এবং বন্য। অদূরে মহাসাগর আর এই অরণ্যের সমুদ্রের মাঝে দুর্দান্ত এই নদীতে ভাসমান মুষ্টিমেয় ক'জন মানুষকে পথভ্রষ্ট বলেই মনে হয়। যখন ভেলাটি এপারে জেটিতে ধাক্কা খেল মনে হল যেন বহুদিনের সঙ্কটময় জলযাত্রার পর সমস্ত নোঙর ছেঁড়া নৌকোটি বুঝি বা ঘন অন্ধকারে এক দ্বীপে এসে পৌঁছল।

তীরে অবশেষে মানুষজনের আওয়াজ শোনা গেল। ড্রাইভার সকলের পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিল। এই গভীর রাতে এক অবাক করা আনন্দোজ্জ্বল ধ্বনিতে সকলে পর্তুগীজ ভাষায় ওদের বিদায় জানাল। গাড়ীটি রওয়ানা দিল।

'ওরা বলেছিল ষাট, ইগুয়াপে পর্যন্ত, কিলোমিটার। আর তিন ঘণ্টা চললেই তুমি পৌঁছে যাবে। সোক্রাত খুশি, ড্রাইভার ঘোষণা করল।

মানুষটি হাসলেন এক উষ্ণ, দরাজ হাসি, ওঁর মতোই বিশাল।

আমিও, সোক্রাত, আমিও খুশি। পথ ভারী কঠিন।'

'খুবই ভারী, দারাস্ত মশায়, তুমি খুবই ভারী' অবিরাম হাসতে লাগল ড্রাইভারটি।

গাড়ীর গতি একটু বেড়েছে। গাছগুলির উঁচু দেওয়াল আর দুর্ভেদ্য বনরাজির মধ্য দিয়ে মৃদু ও মিঠে সুবাসে ভরা রাস্তা দিয়ে গাড়ীটি এগোচ্ছে। রাতের অন্ধকারে জোনাকিগুলি অবিরাম এদিকে ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে লাল চোখো পাখীগুলি পলকের মধ্যে উইন্ড-স্ক্রীনে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। কখনও বা অদ্ভুত বিকট সব আওয়াজ ভেসে আসছে গভীর অন্ধকারের ভিতর থেকে আর ড্রাইভার তার পাশের আরোহীর দিকে তাকিয়ে কৌতুকে চোখ ঘোরাচ্ছে।

বাঁকের পর বাঁক নিয়ে রাস্তা গেছে ছোট ছোট জলধারার উপর বাঁধা নড়বড়ে কাঠের সেতু পার হয়ে। এক ঘণ্টা পরে কুয়াশা ঘন হয়ে উঠল। গাড়ীর আলোগুলিকে ঝাপসা করে দিয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। গাড়ীর ঝাঁকুনি সত্ত্বেও দারাস্ত আধা ঘুমে ঢলে। ...উনি এখন আর স্যাঁতসেঁতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন না। যাচ্ছিলেন আবার সেই 'সের্‌রা'র রাস্তায়, সকালে সাও পাওলো থেকে বেরোবার সময়ে যে রাস্তা ধরেছিলেন তাঁরা। রাস্তা থেকে অবিরাম উড়ছে লাল ধুলো, মুখের ভিতর তার স্বাদ

BanglaBook.org

ঢুকে গেছে, দুই ধারে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই লাল ধুলো এই 'স্তেপ' অঞ্চলের বিরাট অরণ্যানিকে ঢেকে দিয়েছে। প্রচণ্ড সূর্যতাপ ও গিরিদরি ভরা ধূসর পর্বতশ্রেণি, রাস্তায় অনাহারে কৃষকায় ষাঁড়গুলি, আর একমাত্র সঙ্গী ক্লান্ত ডানায় ভর দিয়ে রুক্ষ চেহারার উরুবুস পাখির দল যারা এই লাল মরুর পার দিয়ে এক দীর্ঘ, দীর্ঘ যাত্রায় চলেছে।

উনি চমকে জেগে উঠলেন। গাড়ীটা থেমে গেছে। এখন ওঁরা জাপানে : রাস্তার দুধারে সুকুমার সজ্জায় সজ্জিত বাড়ীগুলির মধ্যে কিমনোর চকিত চমক। ড্রাইভার এক জাপানির সঙ্গে কথা বলছিল। তার পরনে ময়লা ওভারল, মাথায় ব্রাজিলিয় খড়ের টুপি। একটু পরে গাড়ী আবার চলতে শুরু করল।

'ও বলল আর মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার।'

'আমরা কোথায়? টোকিয়োতে?'

'না' রেজিস্ত্রো'তে। এদেশে সব জাপানিরা এখানেই আসে'।

'কেন?'

'জানি না। ওরা হলুদ মানুষ, তুমি তো জানো দারাস্ত সাহেব।'

জঙ্গল আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাস্তা কিছুটা সুগম হল। যদিও একটু পিছল। গাড়ীটা মাঝে মাঝে পিছলে যাচ্ছিল। জানলা দিয়ে তপ্ত ভেজা বাতাস ভেসে এল। টক আস্বাদ।

'গন্ধ পাচ্ছ?' এক ভোজনরসিকের স্বরে ড্রাইভার বলল। 'সেই পুরোনো সাগর। আর শিগ্‌গিরই ইণ্ডয়াপে।'

'যথেষ্ট পেট্রোল থাকলেই হল।' দারাস্ত বললেন। আর পুনরায় শান্তিতে নিদ্রা গেলেন।

ভোরবেলায় দারাস্ত বিছানায় উঠে বসে, যেখানে এখুনি ওঁর ঘুম ভাঙল, অবাক হয়ে সেই ঘরটাকে দেখছিলেন। উঁচু দেওয়ালগুলির মাঝামাঝি পর্যন্ত বাদামি রঙে নতুন কলি ফেরানো হয়েছে। উপরের অংশ এক সময়ে সাদাই ছিল। তবে সিলিং পর্যন্ত এখানে সেখানে হলুদের ছোপ। এক এক ধারে ছটা করে, দু'ধারে দু'সারি খাট। যে দিকে দারাস্ত-এর বিছানা সেই দিকে শেষ প্রান্তে একটা বিছানা অবিন্যস্ত। বিছানাটা খালি। এই সময়ে শব্দ শুনে বাঁ দিকে ফিরে দারাস্ত দেখলেন দরজায় সোক্রাত, দুই হাতে দুই খনিজ জলের বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। 'সুখ স্মৃতি' বলে উঠল সে। নিজেকে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠলেন দারাস্ত। হ্যাঁ এই হাসপাতালটা—স্থানীয় মেয়র যেখানে ওঁদের গতরাতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন তার নাম হল 'সুখ স্মৃতি'। 'নিঃসন্দেহে সুখ স্মৃতি' সোক্রাত বলল। 'ওরা বলল আগে বানাও হাসপাতাল আর তারপরে বানাও জল। আর ততদিন পর্যন্ত 'সুখ স্মৃতি'। নাও সোডার জলে হাত মুখ ধোও।' হাসতে হাসতে, গান গাইতে গাইতে বিদায় নিল ও। কাল সারারাত যে সাংঘাতিক হাঁচি তাকে কাঁপিয়েছে, আর দারাস্তকে দু চোখের পাতা এক করতে দেয়নি,

BanglaBook.org

তার দরুণ ক্লান্তির বিন্দুমাত্র ছাপ ওর চেহারায় নেই।

দারাস্ত-এর ঘুম পুরোপুরি ছুটে গেছে। সামনে, জানালার গ্রিলের ভিতর দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা এক টুকরো লাল মাটির উঠোন দেখতে পেলেন তিনি। অবিরাম ধারাপাত হয়ে চলেছে নিঃশব্দে, লম্বা ঘৃতকুমারী গাছগুলির ওপর। হাতের প্রান্তে হলুদ স্কার্ফ মাথার উপরে ধরে এক মহিলাকে যেতে দেখা গেল। দারাস্ত বিছানায় শুয়ে পড়লেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে খাট থেকে নামলেন। ওঁর ভারে খাটটা শব্দ করে নড়ে উঠল। তখুনি সোক্রাত ঘরে ঢুকল, 'তোমার জন্য, দারাস্ত সাহেব, মেয়র বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।' দারাস্ত-এর মুখের ভাব দেখে ও বলল 'চিন্তা কোরো নি, ওনার কখনোই তড়িঘড়ি নেই।'

মিনারেল জলে দাড়ি কামিয়ে, দারাস্ত বাইরের ঢাকা বারান্দায় বার হলেন। লম্বা চেহারার, গোল সোনার ফ্রেমের চশমার আড়ালে পুরপিতাকে এক মনোহর নেউলের মতো লাগছিল। দেখে মনে হয় বৃষ্টির চিন্তায় মগ্ন, শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু দারাস্ত-কে দেখতে পাওয়া মাত্রই এক প্রাণ ভোলানো হাসি ওঁর চেহারাকে বদলে দিল। ছোট শরীরটাকে সোজা করে তিনি ছুটে গেলেন 'ইঞ্জিনিয়ার সাহেবে'কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরবার জন্য। তখুনি উঠোনের পাশের নিচু পাঁচিলের অপর দিকে একটা গাড়ী ওঁদের সামনে এসে ব্রেক কষল। কাদায় গাড়ীটা পিছলে টেরচাভাবে দাঁড়িয়ে গেল। 'জজ সাহেব এসেছেন' মেয়র বললেন। বিচারপতির পরনেও মেয়রের মতোই নেভি-ব্লু রঙের সুট। জজ মেয়রের থেকে বয়সে তরুণ। অন্তর তাঁর সুষ্ঠু শরীর, দীপ্তিমান চেহারা ও কিশোরোচিত চকিত চাহনি দেখে তাই মনে হচ্ছিল। উঠোন পেরিয়ে উনি ওঁদের দিকে আসছিলেন, সন্তর্পণে জল কাদা এড়িয়ে। দারাস্ত-এর কাছে এসে উনি করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন আর স্বাগত জানালেন ওঁকে। 'ইঞ্জিনিয়ার' সাহেবকে স্বাগত জানাতে উনি গর্ববোধ করছেন। 'সাহেব' এই নগণ্য শহরটিকে সম্মানিত করেছেন। শহরের নিচু জায়গাগুলিকে প্রতি বছর প্লাবন থেকে রক্ষা করবার জন্য ছোট বাঁধটি নির্মাণ করে যে অমূল্য অবদান তিনি এই শহরকে দিতে চলেছেন তার জন্য তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। স্রোতস্বিনীকে বশে আনা, জলরাশিকে আজ্ঞা পালন করান! আঃ কি মহান জীবিকা! ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নাম গরীব ইগুয়াপেবাসীগণ অবশ্যই স্মরণ রাখবে ও বহুদিন পর্যন্ত তাঁর জন্য প্রার্থনা করবে। এই বাগ্মীতা ও উচ্ছাসে মুগ্ধ হয়ে দারাস্ত ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আর কিছু করতে পারলেন না। এমনকি এক বিচারপতির সঙ্গে এক বাঁধের কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পেলেন না। তা ছাড়া পুরপিতার বক্তব্য অনুযায়ী এখন ওঁদের ক্লাবে যেতে হবে যেখানে অন্য গণ্যমান্যরা আসছেন 'ইঞ্জিনিয়ার সাহেব'কে সম্বর্ধনা জানাতে। এর পরে আছে শহরের নিচু জায়গাগুলি পরিদর্শন করা। কারা এই গণ্যমান্যেরা?

'হুম্' মেয়র বললেন 'আমি ; পুরপ্রধান হিসেবে, আর এই যে বিচারপতি মঁসিয়ো কারভালহো, এ ছাড়া বন্দরের ক্যাপটেন, আরও কয়েকজন ছোট খাটো আসবেন।

BanglaBook.org

ওদের নিয়ে আপনাকে বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। ওরা কেউই ফরাসি জানে না।

দারাস্ত সোক্রাত-কে ডেকে বললেন ফের দুপুরে দেখা হবে ওঁদের।

'আজ্ঞা হাঁ' সোক্রাত বলল 'আমি ফোয়ারার বাগানে যাব'

'বাগান?'

'হাঁ সব্বাই চেনে। ডর কোরোনি দারাস্ত মশায়।'

বার হবার সময়ে দারাস্ত লক্ষ করলেন হাসপাতালটা জঙ্গলের সীমানায় তৈরী হয়েছে। জঙ্গলের গাছগুলির পাতাপত্তর এসে হাসপাতালের ছাত প্রায় ছুঁয়েছে। সমস্ত গাছগুলির ওপরে ঝরে চলেছে বৃষ্টির মিহি চাদর আর এই নিবিড় জঙ্গল সেই জলকে এক বিরাট স্পঞ্জের মতো নিঃশব্দে শুষে নিচ্ছে। ধূসর টালিতে ছাওয়া আনুমানিক শ'খানেক বাড়ী নিয়ে ছোট শহরটি নদী আর জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। দূর থেকে জলকলধ্বনি হাসপাতাল পর্যন্ত ভেসে আসছে। গাড়ীটা প্রথমে ভিজে রাস্তায় চলতে শুরু করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বেশ বড়োসড়ো আয়তকার চত্বরে এসে পড়ল। এখানে সেখানে জমা জলের মাঝে লাল কাদায় দেখা যাচ্ছে গাড়ীর টায়ারের, লোহার চাকার আর ঘোড়ার খুরের ছাপ। চারিদিকে রঙ্গীন পলেস্তারা করা নিচু বাড়ী দিয়ে ঘেরা চত্বরটি। পিছনে দেখা যাচ্ছে ঔপনিবেশিক রীতিতে তৈরী গির্জার, নীল আর সাদা রঙের, দুই গোলাকার গম্বুজ। খাঁড়ি থেকে আসা এক নোনা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে রিক্ত এই পরিবেশে। চত্বরের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কিছু ভিজে চেহারার মূর্তি। বাড়ীগুলি বরাবর দেখা গেল এক দল রঙ্গিন পোষাকে কাউ-বয়, কিছু জাপানি, কিছু দো-আঁশলা আমেরিকান ইন্ডিয়ান ও গাঢ় রঙের পোষাকে—দেখে মনে হয় দামী বিদেশীয় পোষাক—কিছু সম্ভ্রান্ত লোক ধীর পায়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে। কোনো তাড়াহুড়ো না করে ওরা সরে গিয়ে গাড়ীটা দাঁড়াবার জায়গা করে দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। গাড়ীটা যতক্ষণে চত্বরের একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াল একদল বর্ষণসিক্ত কাউ-বয় তার চারদিকে জড়ো হয়েছে।

ক্লাবের দোতলায়—একটি বাঁশের তৈরী কাউন্টার ও কতকগুলি স্টিলের গোলাকার টেবিল নিয়ে তৈরি এক বার—এর চারপাশে—বেশ কিছু গণ্যমান্য লোক ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছেন। প্রথমে মেয়র গ্লাস হাতে দারাস্ত-এর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, পরে দারাস্ত-এর সম্মানে সকলে ইক্ষু সুরা পান করলেন। এই সময়ে, যখন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দারাস্ত পান করছিলেন, ঘোড়সওয়ারের পোষাকে এক বিরাট ষণ্ডামার্কা মূর্তি এসে একটু টলতে টলতে ওঁকে ধরে অসম্বন্ধভাবে অনর্গল এবং দ্রুত কিছু বলে যেতে লাগল। ওর কথার মাঝে শুধু 'পাশপোর্ট' কথাটাই ইঞ্জিনিয়ার-এর বোধগম্য হল। কিছু ইতঃস্তত করে উনি পাশপোর্টটি বার করলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে পাশপোর্টটি ওঁর হাত থেকে নিয়ে নিল। পাতাগুলি উল্টেপাল্টে দেখে গুণ্ডার মতো লোকটি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে কিছু বলল। ইঞ্জিনিয়ার-এর নাকের সামনে পাশপোর্টটি দোলাতে দোলাতে ও ওর কথা বলেই

BanglaBook.org

চলল, আর দারাস্ত বিচলিত না হয়ে ক্রুদ্ধ লোকটিকে দেখছিলেন। এই সময়ে বিচারপতি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপারখানা কী? মাতাল লোকটি এক মুহূর্ত এই দুর্বল লোকটি, যে ওদের কথাবার্তার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করেছে, তার দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক দেখল, এবং আরও বিপজ্জনকভাবে টলতে টলতে এই বাধাসৃষ্টিকারীর মুখের ওপর নাড়তে লাগল পাশপোর্টটি। দারাস্ত শান্তভাবে এক ছোট গোল টেবিলের পাশে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তর্কাতর্কির স্বর বেশ চড়ে গেল, আর হঠাৎই জজ এক অতি উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, কেউই ভাবতে পারেনি উনি অত জোরে চেঁচাবেন। কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই, মাতাল ষণ্ডামর্কটি, হাতেনাতে ধরা পড়া দুষ্কর্মকারী শিশুর মতো পিছু হঠল। বিচারপতির আর আদেশের পর সে, শাস্তি পাওয়া স্কুলের ছেলের মতো, দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে অদৃশ্য হল।

বিচারপতি—এতক্ষণে ওঁর স্বর শান্ত হয়েছে—দারাস্তকে বোঝালেন যে ঐ উৎকট লোকটি হল পুলিশের বড়কর্তা। ওর এত দুঃসাহস, ও বলে পাশপোর্টটিতে গণ্ডগোল আছে। আর এই চেঁচামেচির জন্য ওকে শাস্তি পেতে হবে। এর পর বিচারপতি কার্ভালহো, তাঁর চারদিকে ঘিরে দাঁড়ানো গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দের দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন, এবং সম্ভবত উনি ওদের কিছু প্রশ্ন করছিলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর বিচারপতি দারাস্ত-এর কাছে গভীর মার্জনা চাইলেন। তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে দারাস্ত-এর প্রতি সমস্ত ইগুয়াপেবাসীদের যে কৃতজ্ঞতা ও সম্মানবোধ রয়েছে সে কথা বিস্মৃত হয়ে এই রকম আচরণের কারণ—একমাত্র সুরাপানজনিত মত্ততাই হতে পারে—অন্য কোনোভাবেই এর ব্যাখ্যা করা চলে না। সবশেষে তিনি দারাস্তকে অনুরোধ জানালেন যে দয়া করে তিনি নিজেই ঠিক করুন এই দুর্ভাগা লোকটিকে কী শাস্তি দেওয়া হবে। দারাস্ত জানালেন কোনও শাস্তি দিতে তিনি আগ্রহী নন, এটা একটা তুচ্ছ ঘটনা, আর তাছাড়া নদী দেখতে যেতেই উনি বেশি ব্যগ্র। মেয়র কথা বললেন। আকর্ষণীয় সদাশয়তার সঙ্গে উনি বললেন শাস্তি ওকে অবশ্যই পেতে হবে, ওঁরা সকলেই অপেক্ষা করবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ওঁদের মহানুভব অতিথি লোকটির ভাগ্য নির্ধারণ না করছেন ততক্ষণ ও কারারুদ্ধ থাকবে। কোনও প্রতিবাদই এই সহাস্য দৃঢ়বদ্ধতাকে টলাতে পারল না এবং দারাস্তকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল তিনি এ বিষয়ে বিবেচনা করবেন। এর পর সকলে শহরের নিচু জায়গাগুলি দেখতে গেলেন।

নদীর পীতাভ জলরাশি দুই পাড়ের নিচু পিছল জায়গাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। ইগুয়াপের বাড়ীগুলি পিছনে ফেলা ওঁরা অনেকটা এগিয়ে এসেছেন, এখন ওঁরা নদী আর তার পাড়ের উঁচু বাঁধের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন কিছু পাতায় ছাওয়া মাটির কুটির ওই বাঁধের গায়ে মাটি কামড়ে আছে। ওঁদের সামনে, বাঁধের প্রান্তে, জঙ্গল আবার শুরু হয়েছে, নদীর ওপারেও তাই। দুই ধারে গাছগুলির মাঝে নদীর খাতটি হঠাৎ খুব চওড়া হয়ে উঠেছে আর দূরে এক অস্পষ্ট ধূসর সীমারেখায়, সেখানে সে আর পীতাভ নয়, সাগরে গিয়ে মিশেছে। দারাস্ত নিঃশব্দে উপরে বাঁধের দিকে হাঁটতে

BanglaBook.org

লাগলেন। বিভিন্ন সময়ের বন্যার জলরাশি যে ছাপ এই পাড়ের পর রেখে গেছে তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এক কর্দমাক্ত কাঁচা পথ উপরে কুটিরগুলির দিকে চলে গেছে। কুটিরগুলির সামনে নিগ্রোরা দাঁড়িয়ে নীরবে নবাগতদের দেখছে। কেউ কেউ জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করে। আর বাঁধের একেবারে উপরে, বড়োদের সামনে, একসারি পেট ফোলা, রোগা ঠ্যাং, কালো শিশু গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে।

কুঁড়েঘরগুলির সামনে এসে দারান্ত, বন্দরের ক্যাপটেনকে—সাদা ইউনিফর্মে এক মোটাসোটা হাস্যমুখ নিগ্রো—ইশারায় ডাকলেন। স্পেনিশ ভাষায় ওকে জিজ্ঞাসা করলেন একটা কুটিরে যাওয়া যাবে কিনা। নিশ্চয় যাওয়া যাবে, ক্যাপটেন বলল, খুবই ভাল কথা এটা, আর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিশ্চয়ই ওখানে কিছু আকর্ষণীয় বিষয় খুঁজে পাবেন। ক্যাপটেন নিগ্রোদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল, দারান্ত আর নদীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কিছু বলল। ওরা সব শুনল কোনো কথা না বলে। ক্যাপটেনের কথা শেষ হল কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ নড়ল না। আবার বলল ক্যাপটেন, একটু অধৈর্য হয়েই। তারপর ওদের মধ্যে একজনকে ডাকল ক্যাপটেন কিন্তু সে মাথা নাড়ল। এর পর আদেশের সুরে অল্প ক'টি কথা বলল ক্যাপটেন। তখন দল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল লোকটি, দারান্ত-এর সামনে এসে ইশারায় ওঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে বিরূপতা। যথেষ্ট বয়স্ক লোকটির মাথার পশমের মতো ছোট চুলে পাক ধরেছে। কৃষ মুখাবয়বে বয়সের ছাপ পড়েছে কিন্তু শরীর এখনও যুবকোচিত। শক্ত মাংসল কাঁধ, ছেঁড়া জামা ও সূতীর প্যান্টের নিচে পেশীগুলি ফুটে উঠেছে। ওরা এগোল আর পেছনে চলল বন্দর ক্যাপটেন ও বাকী সব কালো লোকেরা। ওরা চড়াই এর মতো আর একটা খাড়া জায়গা বেয়ে উপরে উঠল। সেখানে মাটি, টিন ও কঞ্চি দিয়ে তৈরী কুঁড়েঘরগুলির মাটি কামড়ে থাকা কঠিন আর অনেক বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে ওদের ভিতগুলি শক্ত করতে হয়েছে। মাথায় জল ভরা টিনের ক্যানেস্তারা নিয়ে সেই ঢালু পথে একটি স্ত্রীলোককে নামতে দেখলেন ওরা, মাঝে মাঝেই তার খালি পা পিছলে যাচ্ছিল। তিন দিকে তিনটি কুটির দিয়ে ঘেরা চাতালের মতো একটা ছোট খোলা জায়গায় এসে পৌঁছলেন তাঁরা। লোকটি এগিয়ে গেল একটি কুঁড়েঘরের দিকে। লতায় তৈরী কব্জা দিয়ে আটকানো বাঁশের দরজা ঠেলে ঢুকল লোকটি। নিঃশব্দে পাশে সরে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের দিকে একই ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইল। সে ঘরে ঢুকে প্রথমে, ঘরের ঠিক মাঝখানে, মাটিতে, এক নিভু নিভু আগুন ছাড়া, দারান্ত আর কিছুই দেখতে পেলেন না। পরে এক কোণায়, ঘরের প্রান্তে একটি পিতলের খাট দেখতে পেলেন। গদিটি জীর্ণ আবরণহীন। অন্য কোণায় একটি টেবিলের উপর কিছু পোড়ামাটির বাসনপত্র আর এই দুই এর মাঝে এক ইজেলের মতো স্ট্যান্ড-এর উপর শোভা পাচ্ছে সেন্ট জর্জ-এর এক রঙ্গিন ছবি। এ ছাড়া শুধু কিছু পুরোনো ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড়ের স্তূপ, দরজার ডানদিকে। আর সিলিং থেকে ঝুলছে নানা রঙের সূতির পোশাক, সেগুলি আগুনের উপরে শুকোচ্ছে। দারান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

BanglaBook.org

ধোঁয়ার আর দারিদ্র্যের গন্ধ মাটি থেকে উঠে তাঁর টুঁটি চেপে ধরছিল। পেছনে বন্দর অধিনায়ক হাততালি দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার ঘুরে দাঁড়ালেন। আলোর পশ্চাৎপটে দরজার চৌকাঠে ফুটে উঠল এক লাবণ্যময়ী কৃষ্ণাঙ্গি তরুণীর চেহারা। মেয়েটি ওঁর দিকে একটি পাত্র এগিয়ে দিলে উনি এক গ্লাস ঘন ইক্ষুসুরা পান করলেন। খালি গ্লাসটি নেবার জন্য মেয়েটি রেকাবটি এগিয়ে দিল ও এমন এক কমনীয় ও সজীব ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল যে হঠাৎই দারাস্ত-এর মেয়েটিকে ধরে রাখবার ইচ্ছে হয়েছিল।

কিন্তু ওর পেছনে বেরিয়ে, কুটিরের পাশে জড়ো হওয়া কালো লোকদের ও গণ্যমান্যদের ভীড়ের মাঝে দারাস্ত আর মেয়েটিকে খুঁজে পেলেন না। উনি বৃদ্ধলোকটিকে ধন্যবাদ জানালেন উত্তরে সে শুধু নীরবে মাথা নাড়ল। উনি বিদায় নিলেন। বন্দর অধিনায়ক ওঁর পেছন পেছন এল আর ওর নানা ব্যাখ্যান আবার শুরু করে দিল। জিজ্ঞাসা করল রিও থেকে ফরাসি কোম্পানিটি এসে কবে ওদের কাজ শুরু করতে পারবে, বাঁধটা আগামী বর্ষার আগেই নির্মাণ করা যাবে কি না। দারাস্ত জানতেন না। সত্যি বলতে কি উনি এসব কথা ভাবছিলেনও না। এই পাতলা—অননুভবনীয়—বর্ষায়, উনি শীতল নদীর দিকে নেমে গেলেন। এখানে আসা অবধি যে শব্দ উনি শুনতে পাচ্ছিলেন সেই সর্বত্রপরিব্যাপী বিশাল শব্দ তিনি এখনও শুনতে লাগলেন। সে শব্দ কি গাছপালা থেকে অথবা নদীর জল থেকে আসছে তা তিনি বলতে পারেন না। নদীর পাড়ে এসে দূরে তাকিয়ে দেখলেন তিনি সমুদ্রের ধূসর সীমারেখার দিকে। হাজার হাজার কিলোমিটার ধরে শুধু জল,—আফ্রিকার প্রত্যন্ত সীমায়,—আর আরও দূরে ইউরোপ মহাদেশ যেখান থেকে তিনি এসেছেন।

'ক্যাপটেন' দারাস্ত বন্দর অধিনায়ককে বললেন 'যাদের আমরা এইমাত্র দেখলাম, এদের জীবিকা কি?'

'যখন কিছু কাজ পাওয়া যায় ওরা কাজ করে।' ক্যাপটেন বলল 'আমরা গরিব'।

'ওরাই সবচেয়ে গরিব?'

'সবচেয়ে গরিব'

এই সময়ে জজ এসে পৌঁছলেন, ওঁর দামি জুতো কাদায় পিছলে যাচ্ছিল, জজ বললেন ওরা এর মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে ভালবেসে ফেলেছে, কারণ উনি ওদের কাজ দেবেন।

'আর জানেন তো ওরা প্রতিদিনই নাচতে আর গাইতে খুব ভালবাসে।'

এর পর একই সুরে উনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন দারাস্ত শাস্তির কথা কিছু ভেবেছেন কি না।

'কোন শাস্তি?'

'কেন আমাদের পুলিশ অধিকর্তার?'

'ছেড়ে দিন ওকে'। জজ বললেন সেটা সম্ভব হবে না আর ওকে শাস্তি পেতেই হবে। ততক্ষণে দারাস্ত ইওয়াপের দিকে হাঁটা লাগিয়েছেন।

BanglaBook.org

ফোয়ারার ছোট উদ্যান ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে রহস্যময় ও মনোরম হয়ে উঠেছে। কলা আর প্যান্ডানাস গাছে জড়ানো লতাগুলোর থেকে থোকায় থোকায় নাম না জানা সব ফুল ঝুলে আছে। কাঁচা পথের মোড়ে মোড়ে বসানো পাথরগুলি ভিজে। বহু লোকজন এখন সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দো-আঁশলা লোকেরা, মিউলাটো ও কিছু স্পেনিশ কাউ-বয় নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, কেউ কেউ ধীরগতিতে হেঁটে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে যেখানে ঝোপঝাড় আরও ঘন হয়ে উঠে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। আর সেখান থেকে কোনো ছেদ না দিয়েই জঙ্গলের শুরু হয়েছে।

দারান্ত যখন এই ভীড়ের মধ্যে সোক্রাত-কে খুঁজছিলেন তখন হঠাৎই সে তার পিছনে এসে হাজির হল।

'আজ মোচ্ছবের দিন' দারান্ত-এর উঁচু কাঁধ ধরে লাফাতে লাফাতে হেসে সোক্রাত বলল।

'কিসের উৎসব?'

'হায় গো! তুমি জাননি?' দারান্ত-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবাক সোক্রাত বলল। 'ভগবান যীশুর পুজো যে। পেত্যেক বচ্ছরেই হয় হেথায়। সক্কলেই আসে হাতুড়ি নিয়ে এই গোম্ফায়'

আঙ্গুল দিয়ে সোক্রাত দেখাল, কিন্তু কোনো গুহার দিকে নয়, বাগানের কোণায় যেখানে একদল লোক জড়ো হয়েছে সেই দিকে।

'বুঝলে তো? একদিন ভগবান যিশুর মূর্তি ভেসে এল হেথায়, সাগর থেকে উজান বেয়ে। জেলেরা দেখতে পেল। আহাঃ মরি কী অপরূপ! ধুয়ে মুছে এই গুহায় মূর্তিটিকে রাখল তারা। আর এখন একটা পাথর এই গুহায় গজিয়ে উঠেছে। প্রতি বছর তারই উৎসব। হাতুড়ি দিয়ে পাথরটি থেকে তুমি ভাঙো। টুকরো টুকরো করে তুমি ভাঙো সুখ আর আশীর্বাদ পাবার জন্য। আর মজা কি যতোই ভঙো পাথরটি ততোই আবারও গজিয়ে ওঠে! এ এক অলৌকিক ব্যাপার।'

ওরা গুহার কাছে পৌঁছল। বাইরে দাঁড়ানো লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে গুহার নিচু প্রবেশদ্বার দেখা গেল। ভিতরে অন্ধকারে মোমবাতির কম্পমান আলোয় এক মূর্তিকে দেখা গেল, উবু হয়ে বসে হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে। মানুষটি, এক লম্বা গোঁফওয়ালা কৃশকায় স্থানীয় কাউ-বয়, উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে এল, হাতের খোলা মুঠোয়, সকলে দেখতে পেল, ছোট এক টুকরো ভিজে পাথর। কয়েক মুহূর্ত পরে সাবধানে মুঠি বন্ধ করে লোকটি চলে গেল। আর একজন মাথা নিচু করে গোম্ফায় ঢুকল।

দারান্ত ঘুরে দাঁড়ালেন। চারিদিকে পুণ্যার্থীরা অপেক্ষা করছে, ওঁর দিকে কেউই দেখছিল না। গাছগুলি থেকে ঝরে পড়া পাতলা চাদরের মতো লাগাতার বৃষ্টির দিকেও কেউ খেয়াল করছে না। উনিও অপেক্ষা করছেন, এই গুহাটার সামনে, একই জল ধারাপাতের নিচে, কিন্তু কেন তা জানেন না। উনি অপেক্ষা করেই চলেছেন, সত্যি

BanglaBook.org

বলতে কি, এক মাস ধরে, যবে থেকে উনি এ দেশে এসেছেন। উনি অপেক্ষা করে চলেছেন, গরমে লাল ভ্যাপসানো দিনগুলির মধ্যে। রাতের তারা ভরা আকাশের নিচে। ওঁর তো অনেক কাজ আছে, বাঁধগুলি বাঁধতে হবে, রাস্তাগুলি তৈরি করতে হবে কিন্তু সে সবই যেন আসলে এক ছুতো। এক অজুহাত, কোনো এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার জন্য, এক অকল্পনীয় সাক্ষাৎকারের জন্য, যা তাঁর জন্য বহুদিন ধরে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে পৃথিবীর এই প্রান্তে। নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলেন তিনি, এই ছোট দলের কারোর নজরে না পড়ে সরে গেলেন, বাইরে যাবার রাস্তার দিকে। নদীর দিকে ফিরতে হবে, কাজ শুরু করতে হবে।

প্রবেশ পথে সোক্রাত ওঁর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। ও তখন এক ছোটখাটো, মোটা, চওড়া কাঁধওয়ালা লোকের সঙ্গে, গায়ের রঙ যার কালোর থেকে হলুদই বেশি বলা চলে, জোর গল্পগুজবে হারিয়ে গেছে। লোকটার পুরোপুরি কামানো মাথাটা সুন্দর গোল কপালটাকে আরও চওড়া করে তুলেছে। অপরদিকে ওর বিশাল মসৃণ মুখমণ্ডলকে অলংকৃত করেছে চৌকো করে ছাঁটা, ঘন কালো দাড়ি।

'এ হল চ্যাম্পিয়ন' সোক্রাত পরিচয় করাল 'আগামীকাল শোভাযাত্রায় থাকবে।'

লোকটি, মোটা সার্জের নাবিকের পোষাকে, কোটের নিচে নীল সাদা ডোরাকাটা টি-শার্ট, কালো শান্ত চোখে অনেকক্ষণ ধরে দারাস্ত-কে ভালো করে লক্ষ করল। আর সারাক্ষণই হাসছিল, পুরুষ্ট উজ্জ্বল ঠোঁটগুলির ভেতর থেকে সাদা দাঁতগুলি বার ক'রে।

'ও স্প্যানিশ বলতে পারে' অপরিচিত লোকটির দিকে তাকিয়ে সোক্রাত বলল।

'বলো দারাস্ত সাহেবকে' বলে সোক্রাত নাচতে নাচতে অন্য এক দলের দিকে চলে গেল। লোকটি হাসি থামিয়ে এক সরল কৌতুহলের দৃষ্টিতে দারাস্ত-কে দেখতে লাগল।

'তুমি শুনতে চাও ক্যাপটেন?'

'আমি ক্যাপটেন নই' দারাস্ত বললেন।

'ওই হল। তুমি তো একজন বড়ো মানুষ। সোক্রাত আমাকে বলেছে'

'আমি? না। আমার ঠাকুরদা ছিলেন একজন বড়ো মানুষ। আর তার আগে তার বাবা ও আর সব পূর্বপুরুষেরা। এখন আর বড়ো মানুষ কেউ নেই আমাদের দেশে।

'ও হো বুঝতে পেরেছি' নিগ্রোটি বলল হাসতে হাসতে 'এখন সকলেই নোব্‌ল'

'না ঠিক তা' নয়। এখন আর নোব্‌লরাও নেই আর কমোনার-ও নেই'

ও কিছুক্ষণ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল

'কেউ কাজ করে না? কেউ কষ্টে থাকে না?'

'হ্যাঁ লাখ লাখ লোক'

'তা' হলে তো সবাই কমোনার'

'এক দিয়ে দেখতে গেলে সে কথা ঠিক, ওর কমোনারই বটে। কিন্তু ওদের প্রভু হল পুলিশ আর ব্যবসায়ীরা।'

মিশ্র রক্তের লোকটির দয়ার্দ্র মুখখানি কুঞ্চিত হয়ে উঠল পরে ও গুমরে উঠল 'হুম।

BanglaBook.org

কেনা আর বেচা! আঃ কি নোংরা কাজ। আর পুলিশ কুত্তাদের দাদাগিরি'

হঠাৎই হাসিতে ফেটে পড়ল লোকটা।

'তুমি? বেচো না তুমি?

'প্রায় না ই বলা চলে। আমি রাস্তা বানাই, পুল বাঁধি।

'সেটা ভাল। আমি, জাহাজে খানসামার কাজ করি আমি। যদি চাও তো তোমাকে আমাদের কালো বীন-এর তরকারি রেঁধে খাওয়াতে পারি।'

'ঠিক আছে'

খানসামা এগিয়ে এসে দারাস্ত-এর হাত ধরল।

'শোন। তোমার কথা আমার ভাল লেগেছে। আমিও আমার কথা তোমাকে বলব। হয়তো তোমার ভাল লাগবে।'

প্রবেশপথের কাছে, বাঁশঝাড়ের নিচে, এক স্যাঁতসেঁতে কাঠের বেঞ্চে ও দারাস্ত-কে নিয়ে গিয়ে বসল।

'সাগরে ছিলাম। ইগুয়াপের সমুদ্রোপকূলে। কূলবর্তী বন্দরগুলিতে পেট্রোল সরবরাহ করার এক ছোট ট্যাঙ্কারে। জাহাজে আগুন ধরে গেল। না আমার দোষ নয়, ইস্, আমার কাজ আমি ভালভাবেই জানি। না পুরোপুরি দুর্ভাগ্য। লাইফ-বোটগুলি জলে নামানো গিয়েছিল। রাতে জল বাড়ল, নৌকো পাল্টি খেল, আমি ডুবে গেলাম। ভেসে উঠবার সময়ে মাথায় বোটের চোট লাগল। আমি ভাসতে থাকলাম, গাঢ় কালো রাত্রি, বিরাট জলোচ্ছ্বাস এদিকে আমি ভাল সাঁতার জানি না। ভয় করছিল। হঠাৎ দূরে একটা আলো দেখতে পেলাম। ইগুয়াপের 'বন্ যেশু'র গির্জাটা চিনতে পারলাম। তো, ভগবান যিশুকে বললাম যদি তিনি আমাকে বাঁচান তবে আমি একটা পঞ্চাশ কিলো পাথর মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাব ওঁর গির্জার মিছিলে। বিশ্বাস করবে না, জল শান্ত হল আর আমার প্রাণও। আস্তে আস্তে সাঁতরে উৎফুল্ল চিত্তে আমি কূলে পৌঁছলাম। কাল আমার মানত রাখব।

সহসা সন্দিগ্ধ চোখে সে দারাস্তকে দেখল।

'তুমি হাসছো না তো? অ্যাঁ?'

'না হাসছি না। মানত করলে তা পালন করতে হয়।'

দারাস্ত-এর কাঁধে চাপড় দিল লোকটি।

'এখন চলো আমার ভাই-এর বাড়ীতে, নদীর পাড়ে। তোমাকে কালো বীনের তরকারি খাওয়াব।'

'না আমার কাজ আছে যদি চাও তো রাতে হতে পারে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আজ রাতে বড়ো কুটিরে নাচ আর প্রার্থনা হবে। সন্ত জর্জের উৎসব' দারাস্ত ওকে জিজ্ঞাসা করল সেও নাচবে কি না। খানসামার মুখ সহসা কঠিন হল। এই প্রথম ওর চোখে এক কপটতার ছাপ দেখা গেল।

'না না আমি নাচব না। কাল আমাকে পাথরটা বইতে হবে। পাথরটা ভারী। আমি

BanglaBook.org

যাব রাতে। সন্তের উৎসবে। তাড়াতাড়ি ফিরব।'

'অনেকক্ষণ চলে নাচ?'

'সারারাত, সকালেও কিছুক্ষণ।'

দারান্ত-এর দিকে তাকাল ও। মুখে অস্পষ্ট লজ্জার ছাপ।

'এসো রাতে নাচে। তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনবে, না হলে হয়তো সারারাতই আমি থেকে যাব, নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে পারব না।'

'নাচতে ভালবাসো তুমি?'

এক পেটুকের মতো খানসামার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'আরে হ্যাঁ, ভালবাসি আর তাছাড়া থাকবে সিগার, সন্তেরা, আর মেয়েরা। লোকেরা সব ভুলে যায় কিছুই আর মেনে চলে না।'

'মেয়েরাও আসে? শহরের সব মেয়েরা?'

'শহরের নয়, বস্তিগুলোর।'

খানসামার মুখে হাসি ফিরে এল।

'এস তুমি। ক্যাপটেনকে মেনে চলব আমি। আর তুমি আমাকে আমার মানত পালতে সাহায্য করবে।'

দারান্ত একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এই অর্থহীন মানতে ওঁর কি? কিন্তু উনি এই সরল সুন্দর মুখখানির দিকে তাকালেন যে অনেক ভরসা করে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওর সমস্ত শরীর স্বাস্থ্য আর প্রাণে উজ্জ্বল।

'আসব আমি' দারান্ত বললেন 'এখন কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে হাঁটব।'

কেন উনি জানেন না, কিন্তু ওঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই তরুণী কৃষ্ণাঙ্গির চেহারা যে ওঁকে স্বাগত পানীয় দিয়েছিল।

বাগান থেকে বার হলেন ওঁরা। কর্দমাক্ত পথগুলি ধরে গিয়ে ওঁরা পৌঁছলেন সেই এবড়ো খেবড়ো চত্বরটিতে। নিচু নিচু বাড়িগুলি চারপাশে ঘিরে থাকার জন্য চত্বরটিকে আরও বড়ো দেখাচ্ছিল। দেওয়ালগুলির পলেস্তারা বেয়ে আর্দ্রতা গড়িয়ে পড়ছিল যদিও বৃষ্টির জোর বাড়েনি। স্পঞ্জের মতো আকাশের পরিসরের সীমানা পেরিয়ে নদীর আর গাছপালার মর্মর ধ্বনি অস্ফুটভাবে ভেসে আসছে ওঁদের কাছে। দু'জনেই সমান তালে পা ফেলে চলছিলেন, ভারী পদক্ষেপে দারান্ত, পেশীবহুল শক্ত পায়ে খানসামা। শেষোক্তজন মাঝে মাঝে চোখ তুলে ওর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসছিল। বাড়ীগুলির মাথার ওপর দিয়ে গির্জাটা দেখা যাচ্ছিল, ওঁরা সেইদিকেই চললেন। চত্বরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, পরে আরো কিছু কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে চললেন। রান্নার চড়া গন্ধ ভেসে আসছিল এখন সেখানে। মাঝে মাঝে কোনও দরজায় দেখা যায় কোনও এক মহিলাকে, থালা বা অন্য কোনও রান্নার সরঞ্জাম হাতে, কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে উঁকি দিয়ে পরমুহূর্তেই সরে যেতে। গির্জার সামনে দিয়ে গিয়ে ওঁরা পড়লেন ঐ রকমই নিচু বাড়িভাড়া এক পুরোনো অঞ্চলে আর সেখান থেকেই সহসাই তারা বেরিয়ে এলেন

BanglaBook.org

নদীর পাড়ের কুটিরগুলির পিছনে। অদৃশ্য নদীর জলকল্লোল শুনতে পাচ্ছিলেন তাঁরা। দারাস্ত চিনতে পারলেন জায়গাটা।

'ঠিক আছে আমি চলি। রাতে দেখা হবে।'

'হ্যাঁ, গির্জার সামনে'

কিন্তু খানসামা দারাস্ত-এর হাত ধরেই থাকল। কিছু ইতস্তত করার পর মনস্থির করে বলল।

'আর তুমি? তুমি কখনও প্রার্থনা করনি? মানত করনি?'

'হ্যাঁ, করেছি, বোধহয় একবার'

'জাহাজডুবিতে?'

'সে রকমই বলতে পারো।' দারাস্ত ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার সময়ে খানসামার চোখে ওর চোখ পড়ল, একটু ইতস্তত করে উনি হাসলেন।

'তোমাকে বলতে বাধা নেই, যদিও ব্যাপারটা গুরুত্বহীন। আমার দোষে একজনের মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছিল। আমার মনে হয় আমি তখন প্রার্থনা করেছিলাম।'

'মানত করেছিলেন?'

'করিনি, উচিৎ ছিল মানত করা'

'অনেকদিনের কথা?'

'এখানে আসার অল্প কিছু আগে।'

খানসামা দুই হাতে তার দাড়ি জড়িয়ে ধরল। চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল তার।

'তুমি একজন ক্যাপটেন' বলল ও 'আমার বাড়ী তোমারই বাড়ী। আর তা' ছাড়া তুমি আমাকে আমার মানত রাখতে সাহায্য করবে। এতে তোমারও লাভ হবে। যেন তুমি নিজেরই মানত রক্ষা করছ'

দারাস্ত হাসলেন 'আমার তা' মনে হয় না।

'এ তোমার অহঙ্কার, ক্যাপটেন'

'আগে ছিলাম, অহঙ্কারী, এখন আমি নিঃসঙ্গ। কিন্তু তুমি আমাকে বল তোমার ভগবান যীশু কি সব সময়ই তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন?'

'সবসময়ে? না ক্যাপটেন, সবসময়ে নয়'

'তবে?'

এক সরল শিশুসুলভ হাসিতে ফেটে পড়ল খানসামা।

'আরে বাঃ' লোকটি বলল 'তিনি তো স্বাধীন। তাই নয় কি?'

ক্লাবে অন্য গণ্যমান্যদের সঙ্গে দুপুরে খাবার সময়ে পুরপিতা দারাস্ত-কে বললেন মিউনিসিপ্যালিটির সোনা বাঁধানো খাতায় তাঁকে নাম সই করতে হবে। ওঁর ইগুয়াপে-তে আগমনের মতো বিরাট ঘটনার অন্তত একটা সাক্ষ্য থেকে যাবে। বিচারপতি বলতে উঠে অতিথির গুণাবলী ও প্রতিভার প্রশংসা করলেন। যে সরলতার সঙ্গে এক মহান দেশের প্রতিনিধিত্ব তিনি করছেন সে কথা বললেন ও আরও দু' তিনটি নতুন

BanglaBook.org

প্রশংসাবাক্য জুড়ে দিলেন। দারাস্ত জবাবে শুধু বললেন যে উনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ওঁকে এক অসাধারণ সম্মান দেওয়া হয়েছে। ওঁর কোম্পানির পক্ষেও এই বিশাল, নির্মাণ কাজের বাতগুলি পাওয়া একটা বড় সুযোগ। বিচারপতি এই বিনয়ে অভিভূত। 'হ্যাঁ, ভাল কথা', উনি বললেন 'পুলিশের বড়কর্তার কি করা হবে আপনি কিছু ঠিক করেছেন কি?' দারাস্ত ওঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন 'হ্যাঁ, ভেবেছি'। এক ব্যক্তিগত অনুগ্রহ এবং অসামান্য ক্ষমার উদাহরণ বলে মনে করবেন তিনি যদি ঐ নির্বোধ লোকটিকে তাঁর নামে মাপ করে দেওয়া হয়। তা' হলে ওঁর এই প্রবাস কাল—যেখানে উনি, দারাস্ত, এই সুন্দর ইগুয়াপে শহরের উদার অধিবাসীদের জেনেছেন—এক শান্তি ও সৌহার্দের পরিবেশে শুরু হতে পারে। বিচারপতি হাস্যমুখে মন দিয়ে শুনছিলেন ও মাথা নাড়ছিলেন। এক বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো দারাস্ত-এর কথাগুলি উপভোগ করলেন ও পরে মহান ফরাসি দেশের এই উদার পরম্পরাকে সাধুবাদ দেবার জন্য ওঁর অনুচরদের বললেন। দারাস্ত-এর দিকে ফিরে জানালেন তিনি সন্তুষ্ট 'আর ব্যাপারটা যখন মিটেই গেল তখন আজ পুলিশ প্রধানের সঙ্গে আমরা রাতের ভোজ খাব।' কিন্তু দারাস্ত জানালেন রাতে ওঁর বন্ধুরা ওঁকে নাচের উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে—বস্তিতে। 'আঃ জেনে খুশি হলাম আপনি ওখানে যাচ্ছেন, দেখবেন আমাদের লোকদের ভাল না বেসে আপনি পারবেন না।'

রাতে দারাস্ত, খানসামা আর তার ভাই নিভে যাওয়া আগুনের পাশে বসে ছিল। যে কুঁড়েঘরটিতে সকালে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এসেছিলেন সেই ঘরটিতেই। খানসামার ভাই দারাস্ত-কে আবার দেখে অবাক হল না। ও স্পেনিশ খুব সামান্যই জানে আর বেশির ভাগ সময়ে শুধু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছিল। আর খানসামা, প্রথমে গির্জা সম্বন্ধে ওর নানা জ্ঞানের কথা বলল এবং পরে কালো ফ্রেঞ্চবীনের সুপ নিয়ে অনেক আলোচনা করল। এখন দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খানসামা আর তার ভাইকে দারাস্ত যদিও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন কিন্তু ঘরের প্রান্তে বসা বৃদ্ধা এবং কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীকে, যে আবারও ওকে সুরা পরিবেশন করেছিল, তিনি ঝাপসা দেখছিলেন। নিচে নদীর একঘেয়ে শব্দ।

খানসামা উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'সময় হয়েছে।' পুরুষেরা উঠে পড়ল কিন্তু মেয়েরা নড়ল না। পুরুষেরা বাইরে গেল। কিছু ইতস্তত করে দারাস্ত ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এখন বেশ অন্ধকার হয়েছে, বৃষ্টি থেমে গেছে। ফ্যাকাশে কালো আকাশ যেন ঘনীভূত হয়ে আছে। স্বচ্ছ কালো জলে, নিচে দিগন্তের সীমারেখায়, তারারা জ্বলে উঠছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিভে যাচ্ছিল, একে একে, নদীর মধ্যে পড়ে গিয়ে। যেন আকাশ এই শেষ আলোগুলিকে বিতৃষ্ণায় দূর করে দিচ্ছে। ভারী বাতাসে জল আর ধোঁয়ার গন্ধ। অতি নিকটেই বিশাল অরণ্যের মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু সব কিছুই নিশ্চল। হঠাৎ দূর থেকে ঢাকের আওয়াজ আর গান ভেসে উঠল। প্রথমে অস্ফুট পরে পরিষ্কার, আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে শব্দটি থামল। একটু পরে এক কৃষ্ণাঙ্গী

BanglaBook.org

মেয়ের দলের শোভাযাত্রা দেখা গেল, পরনে অতি নিচু কোমরের স্কার্টের সাদা সিল্কের ড্রেস। অত্যন্ত আঁটোসাঁটো লাল ঘোড়সওয়ারের পোষাকে এক লম্বা নিগ্রো, রঙ্গীন দাঁতের নেকলেস গলায়, এই মেয়েদের অনুসরণ করছিল আর তার পিছনে ছিল অসম্বদ্ধভাবে একদল সাদা পাজামা পরা লোক, ত্রিভুজাকৃতি ধাতব বাজনা ও চওড়া ছোট ছোট ঢোলক হাতে কিছু বাজনদার। খানসামা বলল ওদের সঙ্গে যেতে হবে।

নদীর পাড় দিয়ে গিয়ে শেষ কুঁড়েঘর থেকে কয়েকশ' মিটার দূরে যে কুটিরটিতে ওরা পৌঁছল, সেটি একটি বড়ো, খালি এবং অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক ঘর যার ভিতরের দেওয়ালে রং এর পলেস্তারা। শক্ত মাটির মেঝে, খড় ও শণের চালাটা এক কেন্দ্রীয় খাম্বার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালগুলি খালি। ঘরের প্রান্তে পাতা দিয়ে ঢাকা এবং মোমবাতি—যা কোনোমতে ঘরের অর্ধেক অংশ আলোকিত করেছে—দিয়ে সাজানো একটি বেদীতে সেন্ট জর্জ-এর সুন্দর রঙ্গীন ছবি। প্রসন্ন হাসিমুখের সেন্ট জর্জ এক গুঁফো ড্রাগনকে প্রায় হারিয়ে দিয়েছেন। বেদীর নিচে পাথরের রংএর কাগজ দিয়ে সাজানো এক কুলুঙ্গিতে এক বাটি জল ও একটি মোমবাতির মাঝে তেল চকচকে লাল মাটির এক ভীষণদর্শন দেবতার মূর্তি শোভা পাচ্ছে। মূর্তির হাতে রূপোলি কাগজে মোড়া এক অসমঞ্জস তরোয়াল।

খানসামা দারাস্ত-কে ঘরের এক কোণায় নিয়ে গেল। দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল ওরা। 'কারো অসুবিধা না করেই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে' নিচু স্বরে সে বলল। কুটিরটি নরনারীতে ঠাসাঠাসি হয়েছে। ঘর এর মধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে। ছোট বেদীটির দুই পাশে বাদকেরা জায়গা করে নিয়েছে। পুরুষ ও নারী নাচিয়েরা দুই আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরুষেরা ভিতরের দিকে। কেন্দ্রবিন্দুতে লাল টাইট জামা পরা নিগ্রো দলপতি। দারাস্ত বুকের ওপর হাত দুটি ভাঁজ করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন।

কিন্তু দলপতি নাচিয়েদের বৃত্ত ভেদ করে ওদের দিকে এগিয়ে এল এবং গম্ভীরভাবে খানসামাকে কিছু বলল। 'বুকের ওপর থেকে হাত নামাও, ক্যাপটেন। নিজেকে আবেষ্টনী দিয়ে তুমি সন্তের আত্মার অবতরণে বাধার সৃষ্টি করছ।' বাধ্যের মতো হাত নামিয়ে নিলেন দারাস্ত। বিশাল স্বেদ-দীপ্ত মুখ আর লম্বা ভারি হাত পাগুলি নিয়ে, তখনো দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, ওঁকে এক দয়ালু জান্তব দেবতার মতোই দেখাচ্ছিল। লম্বা নিগ্রো দলপতি ওঁকে কিছুক্ষণ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই এক পরিষ্কার উঁচু স্বরে ও গানের প্রথম কলিটি শুরু করল এবং আর সকলে ড্রামের বাজনার সঙ্গে ধুয়ো ধরল। বৃত্ত দুইটি বিপরীত দিকে ঘুরতে লাগল, ভারী পায়ে, ঝুঁকে পড়ে ওরা নাচতে লাগল। তালে তালে পা ফেলছিল ওরা, দুই আলাদা লাইনে, ওদের পেছনদিকটা অল্প দুলিয়ে।

গরম বেড়ে গেছে। এদিকে যতিগুলি আস্তে আস্তে কমছে। বিরতি অনেক দেরিতে হচ্ছে আর নাচের গতি ক্রমশই বাড়ছে। অন্য নাচিয়েদের ছন্দপতন না করিয়ে, বা

BanglaBook.org

নিজে নাচ বন্ধ না করে লম্বা নিগ্রোটি আবার বৃত্তগুলি ভেদ করে বেদীটির দিকে এগিয়ে গেল। এক গ্লাস জল এবং একটি প্রজ্বলিত মোমবাতি নিয়ে ও ফিরে এল আর বাতিটি কুটিরের কেন্দ্রে মাটিতে লাগিয়ে দিল। বাতির চারদিকে ও জল ঢালল, দুইটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে। আবার উঠে দাঁড়াল, ওর উন্মত্তের মতো চোখ দুটি ছাদের দিকে ফিরিয়ে। সমস্ত শরীর শক্ত করে দিয়ে ও স্থির দাঁড়িয়ে রইল। 'সেন্ট জর্জ আসছেন, দেখ, দেখ' খানসামা বিস্ফারিত চোখে বলল।

কোনো কোনো নাচিয়ের এখন মোহাবিষ্ট অবস্থা। এক জড়ত্বপূর্ণ আবেশ, কোমরে হাত, পায়ের গতি যান্ত্রিক, নিবদ্ধ চোখের দৃষ্টিতে এক শূন্যতা। অন্যেরা নাচের গতি বাড়িয়ে দিল, হিস্টিরিয়া গ্রস্তের মতো শরীর বাঁকাচ্ছিল আর এক অদ্ভুত, দুর্বোধ্য চিৎকার শুরু করে দিল। চিৎকার ক্রমশ বাড়তে লাগল এবং এক গোষ্ঠিবদ্ধ কোলাহলে পরিণত হল। দলপতি, তখনো ঊর্দ্ধ পানে তাকিয়ে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এক বিকট চিৎকারে কিছু অস্ফুট শব্দ বললেন। শব্দগুলি পুনরাবৃত্ত হচ্ছিল। 'দেখ' খানসামা বলল : 'উনি বলছেন — উনি ভগবানের যুদ্ধক্ষেত্র।' দারাস্ত বিস্মিত হয়ে দেখলেন খানসামার স্বর বদলে গেছে, সে স্থির দৃষ্টিতে, মুষ্টিবদ্ধ হাতে, সামনে ঝুঁকে পড়ে তালে তালে পা ফেলে অন্যদের মতো নেচে চলেছে। উনি আরও টের পেলেন, উনি নিজেও বেশ কিছুক্ষণ হল, জায়গা থেকে না সরে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে নেচে চলেছেন।

কিন্তু ঢাকগুলি সহসা প্রচণ্ড জোরে বেজে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গেই লাল পোষাক পরা শয়তান নিজেকে যেন শৃঙ্খলমুক্ত করে ফেলল। অগ্নিবর্ণ চোখ করে সে চার হাত পা চতুর্দিকে ছুঁড়তে লাগল। হাঁটু মুড়ে প্রথমে এক পা পরে আর এক পায়ের উপর ভর দিয়ে ও নেচে চলল এবং গতি এত বাড়িয়ে দিল, মনে হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত ওর হাত পা ছিঁড়ে যাবে বুঝি। এমন সময়ে, এই দামামার বজ্রনির্ঘোষের মধ্যেই হঠাৎ এক লাফ দিতে গিয়ে ও থেমে গেল। এক ভয়ঙ্কর ও গর্বিত চোখে ও সহকারীদের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার কোণ থেকে একজন নাচিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এল আর হাঁটু গেড়ে বসে একটা ছোট তরবারি এই ভূতগ্রস্ত লোকটির দিকে এগিয়ে দিল। লম্বা নিগ্রোটি তরবারি হাতে নিয়ে, চারিদিকে তাকাতে তাকাতে, মাথার উপর তরবারিটি ঘোরাতে লাগল। সেই মুহূর্তেই দারাস্ত লক্ষ করলেন খানসামা ওদের সঙ্গে নাচে যোগ দিয়েছে। ওঁর পাশ থেকে কখন সে চলে গেছে ইঞ্জিনিয়ার খেয়াল করেননি।

এই রক্তিম পরিবর্তনশীল আলোতে, এক শ্বাসরোধকারী ধুলো মেঝে থেকে উপরে উঠছে। বাতাস আরো ভারী হয়ে শরীরে লেপ্‌টে যাচ্ছে। দারাস্ত টের পেলেন উনি ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। যে বিরাট সিগারেটগুলি নাচিয়েরা নাচ না থামিয়ে টেনে যাচ্ছিল—উনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না কেমন করে সেগুলি ওরা জোগাড় করল। সেই অদ্ভুত গন্ধে কুটিরটি ভরে উঠেছে, ওঁর মাথা সামান্য ঘুরছে। শুধু দেখতে পেলেন খানসামাকে, নাচতে নাচতে এখন ওঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সেও সিগারে টান দিচ্ছিল। 'ওটা খেওনা' দারাস্ত বললেন। খানসামা নাচের তাল না কেটে,

BanglaBook.org

এক অস্ফুট প্রতিবাদের শব্দ তুলল আর সিগার টেনেই চলল। ওর দৃষ্টি কুটির কেন্দ্রের থামটির উপর ন্যস্ত। ওর মুখের ভাব এক ভূপতিত মুষ্টিযোদ্ধার মতো, ঘাড় পর্যন্ত উঠে আসছে এক লম্বা এবং স্থায়ী কাঁপুনি। ওর পাশে এক বিশালকায় নিগ্রো রমণী তার জান্তব মুখাবয়ব ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে ঘোরাচ্ছিল আর ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছিল। কিন্তু বিশেষ করে নিগ্রো তরুণীরা এক ভয়াবহ আবেশে আবিষ্ট ছিল। পা দুটি মাটিতে আবদ্ধ রেখে সমস্ত শরীরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক ঝাঁকুনি যা কাঁধের কাছে এসে হিংস্র রূপ নিচ্ছিল। মাথাগুলি সামনে পিছনে দোলাচ্ছে যেন আক্ষরিক ভাবেই মুণ্ডহীন দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে সকলে এক বেসুরো চিৎকার জুড়েছে, না থেমে, এবং আপাতদৃষ্টিতে দম না নিয়ে। এক চিৎকার যার কোনও উচ্চাবচ্চ নেই, শরীরের সমস্ত স্নায়ু ও পেশীগুলি যুক্ত করে নিয়ে এক শক্তিশালী চিৎকার যা ওদের প্রত্যেকের ভিতরের এক জন্তুকে—যা এ পর্যন্ত একেবারেই নীরব ছিল—শব্দে প্রকাশ করল। চিৎকার থামল না আর মেয়েরা একের পর এক ভূপতিত হচ্ছিল। নিগ্রো দলপতি প্রত্যেকের পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে দ্রুত ও কতকটা যান্ত্রিক ভঙ্গিতে ওদের কপালগুলি ওর বিশাল কালো পেশীবহুল হাত দিয়ে চেপে ধরছিল। ওরা উঠে পড়ছিল, টলতে টলতে আবার নাচে যোগ দিচ্ছিল, আবার চিৎকার শুরু করছিল। প্রথমে নিচুস্বরে পরে ক্রমশ উঁচু স্বরে এবং দ্রুতলয়ে। এর পরে ওরা আবার পড়ে যাচ্ছিল ও আবারও উঠছিল। এরকম বহুক্ষণ চলল, ওদের স্বরক্রমে দুর্বল, পরিবর্তিত হয়ে এক কর্কশ চিৎকারে পরিণত হল, ওদের দম বন্ধ হয়ে হিক্কার মতো উঠছিল ও ওদের সমস্ত শরীরকে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পেশগুলি শক্ত করে নাচার পরিশ্রমে ও নিজের নীরবতায় দমবন্ধ হয়ে পরিশ্রান্ত দারাস্ত টলছিলেন। এই গরম, ধুলো, ধোঁয়া আর সিগার আর লোকেদের শরীর নিঃসৃত গন্ধে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। চারিদিকে তাকিয়ে উনি খানসামাকে খুঁজলেন। ওর পাত্তা নেই। দারাস্ত দেওয়ালে হেলান দিয়ে আস্তে আস্তে বসে পড়লেন, বমির উদ্রেককে দমন করে।

যখন চোখ খুললেন, দেখেন বাতাস তখনও শ্বাসরোধকারী কিন্তু গোলমাল বন্ধ হয়েছে। শুধু নিচু গ্রামে ঢাকগুলি বেজে চলেছে। আর কুটিরের কোণায় কোণায় সাদা পোষাকে লোকের দল নাচের তালে পা দাপিয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যিখানে, জলের গ্লাস ও মোমবাতি সেখান থেকে সরানো হয়েছে, একদল তরুণী নিগ্রো অর্ধসম্মোহিতভাবে আস্তে আস্তে নেচে চলেছে যেন বাজনার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। চোখ বন্ধ রেখে, তবু সোজা দাঁড়িয়ে, ধীরে সামনে পিছনে দুলছে, বুড়ো আঙুলের উপর ভর করে, প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ওদের মধ্যে দু'জন, স্থূলাঙ্গী, তালপাতার আড়ালে মুখ ঢেকে আছে। অন্য এক তরুণীকে ঘিরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘাঙ্গী তন্বী তরুণীটির পরনে জেল্লাদার পোষাক। দারাস্ত দেখেই চিনতে পারলেন যার বাড়ীতে তিনি অতিথি হয়েছিলেন এ তারই মেয়ে। পরণে সবুজ পোষাক, মাথায়, সামনের

BanglaBook.org

দিকে ওপরে তোলা, পালক লাগানো, সবুজ জাল দেওয়া শিকারীর টুপি, হাতে সবুজ আর হলুদ ধনুক, তীরের প্রান্তে বেঁধানো এক বহু রঙ্গের পাখি। ওর পেলব শরীরের উপর ওর সুশ্রী মুখখানি অল্প দুলছিল একটু পিছনে হেলে, ওর নিদ্রালসা মুখাবয়বে এক করুণ সরলতা। বাজনা থেমে গেলেও তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে অল্প দুলছিল। ঢাকের বাজনার তাল ক্রমশ দ্রুতগতি হয়ে এক অদৃশ্য সহায় হয়ে উঠল যাকে কেন্দ্র করে ওর শিথিল নাচ চলল যতক্ষণ না আবার বাজনা ভারসাম্যের সীমায় এসে থেমে গেল এবং মেয়েটি তীক্ষ্ণ অথচ সুরেলা চিৎকারে এক অদ্ভুত পাখীর ডাক ডেকে উঠল।

দারাস্ত এই ধীরগতি নাচে মুগ্ধ হয়ে এই কৃষ্ণাঙ্গী ডায়ানাকে দেখছিলেন, হঠাৎই খানসামার আবির্ভাব ঘটল, ওর মসৃণ মুখ এখন বিকৃত। চোখে নেই উদারতার চিহ্ন আছে শুধু এক নিগূঢ় ব্যগ্রতা। ঠাণ্ডা গলায়, যেন অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলছে। সে বলল 'অনেক রাত হল ক্যাপটেন ওরা সারারাত নাচবে, কিন্তু তোমার এখানে থাকাটা ওরা পছন্দ করছে না।' মাথা ভারী হয়ে গেছে, দারাস্ত উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে খানসামাকে অনুসরণ করে দরজায় পৌঁছলেন। চৌখাটে খানসামা পাশে সরে গিয়ে বাঁশের দরজাটা খুলে ধরল আর দারাস্ত বার হলেন। উনি খানসামার দিকে ঘুরে দেখলেন ও ওর জায়গা থেকে নড়েনি। 'চলে এস। কিছুক্ষণ পরেই তোমাকে পাথরটা বইতে হবে।'

'আমি থাকছি' শক্ত গলায় সে বলল।

'আর তোমার মানত?'

কোনো জবাব না দিয়ে খানসামা দরজাটা আস্তে ঠেলতে লাগল, দারাস্ত এক হাতে দরজাটা খুলে ধরে রেখেছিলেন, এক সেকেণ্ড পরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দারাস্ত ছেড়ে দিলেন। সরে গেলেন ওখান থেকে।

শীতল সুবাসে ভরা সেই রাত। বনের মাথায়, এক অদৃশ্য কুয়াশার আড়ালে, দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের কয়েকটি ক্ষীণ তারা কাঁপছিল। বাতাস আর্দ্র ও ভারী। তবুও কুটিরটি থেকে বার হবার পরে সেই বাতাস মধুর, শীতল মনে হল। দারাস্ত ঢালু পিছল পথ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রথম কুঁড়েঘরগুলি পর্যন্ত পৌঁছলেন, খানা খোন্দল ভরা রাস্তায় এক মাতালের মতো চলতে লাগলেন। অদূরে বনের মর্মর ধ্বনি, নদীর কল্লোল বাড়ছে। এই রাতে সমস্ত মহাদেশটি প্রকট হয়ে উঠছে আর দারাস্ত-এর মনে ভরে উঠেছে এক প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। ওঁর মনে হল গোটা দেশটাকেই উগরে দিতে পারেন, এর বিশাল ভূমিখণ্ডের বিষণ্ণতা, এর অরণ্যের নীলাভ সবুজ আলো, রাতে এর নির্জন বিশাল নদীগুলির ছলছলানি। এই দেশ অতি বিশাল, রক্ত আর ঋতু এখানে একসাথে মিশেছে, সময় দ্রবীভূত হয়ে গেছে। জীবন এখানে মাটির সমতলে আর একে জানতে হলে এখানে শুতে হবে, ঘুমিয়ে পড়তে হবে, অনেক অনেক বছর ধরে, এই কাদামাটির উপর অথবা এর শুকনো মাটির উপর। ওখানে য়ুরোপে, লজ্জাজনক অসম্মান এবং হিংস্র আগ্রাসী অসন্তোষ। এখানে নির্বাসন অথবা নিঃসঙ্গতা, অধীর,

BanglaBook.org

বেগবান উন্মত্তদের মাঝে, যারা মরবার জন্যই নেচে চলেছে। কিন্তু উদ্ভিদের গন্ধবিধুর এই আর্দ্র রাতে, সেই আধা ঘুমন্ত রূপসী মেয়েটির গলায় আহত পাখির চিৎকার, তাঁর কানে ভেসে আসছিল।

সারা রাত অনিদ্রার পরে এক প্রচণ্ড মাথা ধরার মধ্যে যখন দারাস্ত-এর ঘুম ভাঙল তখন সারা শহর ও স্থাবর অরণ্যকে এক আর্দ্র গরম পিষে ফেলছে। হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উনি এখন অপেক্ষা করছেন, বন্ধ হওয়া ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে সময় ঠাহর করতে পারছিলেন না। এত বেলায় শহর এত নিঃশব্দ যে উনি অবাক হয়ে গেছেন। প্রায় পরিষ্কার নীল আকাশ বাড়ীগুলির ধূসর ছাদ পর্যন্ত নেমে এসেছে। হাসপাতালের উল্টোদিকের বাড়িতে হলুদ ডানার উরুবুস পাখির দল গরমে অবশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। ওদের মধ্যে একটা পাখি হঠাৎ ছট্‌ফট্‌ করে উঠল, হাঁ করে দু'বার ওর ধুলো মাখা ডানা ঝাপটাল যেন উড়ে যেতে চায়। ছাদের কয়েক সেন্টিমিটার উপরে উঠে আবার পড়ে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ইঞ্জিনিয়ার শহরের দিকে নামতে শুরু করলেন। প্রধান চত্বরটি এখন জনশূন্য, আশেপাশের রাস্তাগুলি, যেখান দিয়ে উনি এইমাত্র এলেন সেগুলিও খালি। দূরে নদীর দুই ধারে এক নিচু কুয়াশা জঙ্গলের উপর ভাসছে। গরম সোজাসুজি ওপর থেকে আসছে, দারাস্ত কোথাও একটা কোণায় ছায়া খুঁজছিলেন এর হাত থেকে বাঁচবার জন্য। তখন তিনি এক বাড়ির ঝুল-বারান্দার নিচে একটি বেঁটে লোককে দেখতে পেলেন তাঁর দিকে ইশারা করছে। কাছে গিয়ে সোক্রাতকে চিনতে পারলেন।

'এই যে, দারাস্ত সাহেব, তোমার ভাল লাগল? উৎসব?'

দারাস্ত বললেন কুটিরের মধ্যে প্রচণ্ড গরম ছিল আর ওঁর ভাল লেগেছে রাত আর আকাশ।

'হ্যাঁ। তোমার দেশে শুধুই প্রার্থনা সভা হয়। কেউ নাচে না'

ও দু হাত কচলাচ্ছিল, এক পায়ের উপর লাফাচ্ছিল আর পাক খাচ্ছিল। দম ফাটা হাসি হাসছিল।

'না। অসম্ভব। ওরা একেবারেই অসম্ভব।'

পরে ও দারাস্তকে কৌতূহলি দৃষ্টিতে দেখল।

'আর তুমি? তুমি প্রার্থনা সভায় যাচ্ছ?'

'না'

'তবে কোথায় যাচ্ছ?'

'কোথাও না। আমি জানি না'

সোক্রাত হাসতেই লাগল

'অসম্ভব। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গির্জা ছাড়া? সব কিছু ছাড়া? অসম্ভব।'

দারাস্ত-ও হাসছিলেন

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, বুঝলেতো—আমি আমার জায়গা খুঁজে পাইনি। তাই চলে এসেছি।'

'আমাদের সাথে থাকো দারাস্ত সাহেব, তোমাকে ভালবাসি আমি'

'আমিও তো চাই সোক্রাত, কিন্তু আমি তো নাচতে জানি না' ওদের হাসির আওয়াজ এই নির্জন শহরের নৈঃশব্দের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

'ওঃ হ্যাঁ,' সোক্রাত বলল 'ভুলে গেসলাম। মেয়র তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। ক্লাবেই উনি মধ্যাহ্নভোজন সারবেন।' কোনো সূচনা না দিয়েই ও হাসপাতালের দিকে হাঁটা লাগাল। 'যাচ্ছ কোথায়?' দারাস্ত চেঁচিয়ে বললেন। 'ঘুমোতে' নাসিকা গর্জনের আওয়াজ তুলে সোক্রাত বলল 'শীগ্‌গিরই শোভাযাত্রা।' এবং প্রায় ছুটতে ছুটতে ফের নাক ডাকা শুরু করল সে।

শোভাযাত্রা দেখবার জন্য মেয়র দারাস্ত-কে এক সম্মানজনক জায়গা দিতে চাইছিলেন কেবল। এক প্লেট মাংস ভাত, যা নাকি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকেও সারিয়ে তোলে, ওঁর সঙ্গে ভাগ করে খেতে খেতে উনি ইঞ্জিনিয়ারকে বিশদভাবে বললেন—প্রথমে ওঁরা গির্জার সামনে, বিচারপতির বাড়ীর ব্যালকনিতে দাঁড়াবেন—সেখান থেকে শোভাযাত্রা বার হতে দেখা যাবে। পরে ওঁরা বড়ো রাস্তায় পৌরভবনে যাবেন। এই বড়ো রাস্তা গির্জায় গিয়ে পড়েছে আর এই রাস্তায়ই গির্জায় ফেরার পথে অনুতাপীদের শোভাযাত্রা যাবে। তখন বিচারপতি আর পুলিশ প্রধান দারাস্ত-এর সঙ্গে থাকবেন, মেয়র থাকতে পারবেন না। কারণ ওঁকে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ প্রধান ক্লাবের হলেই ছিলেন, এবং এক মুহূর্ত বিশ্রাম না নিয়ে দারাস্ত-এর পিছন পিছন ঘুরছিলেন, মুখে এক অক্লান্ত হাসি আর সমস্ত সময়েই কিছু বলে যাচ্ছিলেন, দুর্বোধ্য কিন্তু নিঃসন্দেহে দারাস্ত-এর জন্য কিছু খোসামুদি কথা। যখন দারাস্ত নামছিলেন তখন পুলিশ প্রধান ছুটে গিয়ে ওঁর যাবার পথ পরিষ্কার করছিলেন আর সমস্ত দরজা ওঁর জন্য খুলে ধরছিলেন।

প্রচণ্ড রোদ, গ্রামটি তখনো নির্জন, ওঁরা দুজনে বিচারপতির বাড়ীর দিকে নীরবে চললেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু ওঁদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ কাছের রাস্তায় একটা পটকা ফেটে উঠল আর সেই শব্দে সমস্ত বাড়ির ছাদে ভারি, পালকবিহীন গলার উড়ুবুস পাখিগুলি চমকে গিয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক ডজন পটকা একসঙ্গে চারদিকে ফাটল, লোকজন বাড়ীগুলির থেকে বেরিয়ে সরু রাস্তাগুলি ভরে তুলল।

বিচারপতি গর্ব বোধ করছেন—তিনি বললেন—ওঁর এই গরীবখানায় দারাস্ত-কে স্বাগত জানাতে। নীল কলি করা ব্যারোক স্টাইলের এক সুন্দর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন ওঁরা। বারান্দায়, দারাস্ত যখন এগোচ্ছিলেন, দরজাগুলি খুলে যাচ্ছিল আর বাচ্চাদের কালো মাথাগুলি বেরিয়ে আসছিল আর চাপা হাসির শব্দের সাথে, ফের ঢুকে যাচ্ছিল। স্থাপত্যে সুন্দর বড়ো ঘরটিতে, শুধু কিছু বেতের আসবাব আর বড়ো বড়ো খাঁচা। ভেতরে পাখিগুলি খুব চেঁচাচ্ছে। যে ব্যালকনিটিতে ওঁরা বসলেন সেখান

BanglaBook.org

থেকে গির্জার সামনের ছোট চত্বরটা দেখা যাচ্ছে। জনতা সে জায়গাটা ভরে ফেলতে শুরু করেছে। আকাশ থেকে নেমে আসা গরমের ঢেউ প্রায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেই গরমে নিশ্চল ও অস্বাভাবিকভাবে নীরব জনসমুদ্র। শুধু বাচ্চারা দৌড়োদৌড়ি করছে আর মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছে পটকাগুলিতে আগুন লাগাবার জন্য আর একটু পরেই সেগুলি ফেটে উঠছে একটার পর একটা। এই ব্যালকনি থেকে গির্জাটিকে, তার পলেস্তারা করা দেওয়াল, নীল কলি ফেরানো কয়েক ডজন সিঁড়ি, তার নীল ও সোনালী দুই গম্বুজ সমেত খুবই ছোট দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ গির্জার ভেতরে অর্গ্যান বেজে উঠল। জনতা গির্জার ঢাকা বারান্দার দিকে ফিরে চত্বরের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল। পুরুষেরা মাথার টুপি খুলল, নারীরা নতজানু হল। দূর থেকে অর্গ্যানের বাজনা শোনা যাচ্ছিল বহুক্ষণ ধরে, কতকটা কুচকাওয়াজের বাজনার মতো। জঙ্গলের দিক থেকে এক অদ্ভুত পাখার আওয়াজ ভেসে এল। স্বচ্ছ ডানা আর পলকা গঠনের একটা ছোট্ট উড়োজাহাজ, চিরন্তন এই ধরিত্রীর সঙ্গে একেবারেই বেমানান, গাছগুলির উপরে উড়ে এল, চত্বরের দিকে একটু নেমে এল ও এক বড়ো চাকির মতো গর্জন করতে করতে চলে গেল, উপরের দিকে চেয়ে থাকা মানুষগুলির মাথার উপর দিয়ে। উড়োজাহাজটি ঘুরে মোহনার দিকে চলে গেল।

ওদিকে, গির্জার ভিতরে ছায়ায়, এক অস্পষ্ট এলোপাথারি নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। অর্গ্যানের বাজনা থেমে গেছে তার বদলে ঢাক আর কাঁসরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল কিন্তু বারান্দার নিচে থেকে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। অনুতাপী পাপীরা, কালো প্রার্থনার পোষাকে, একে একে গির্জা থেকে বার হয়ে দরজার সামনে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল ও পরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। ওদের পেছনে এল শ্বেতাঙ্গ অনুতাপীরা হাতে লাল, নীল পতাকা। পরে এল দেবদূতের পোষাকে বালকদের একটা ছোট দল, মেরীর সন্তানদের ভ্রাতৃ-সমাজ, ছোট ছোট কালো মুখগুলি গম্ভীর। সবশেষে শহরের গণ্যমান্যেরা, সকলেই তাদের গাঢ় রঙ্গের সুটের নিচে ঘামছিল, বয়ে নিয়ে এল একটি নানারঙ্গের তাঞ্জাম যাতে স্বয়ং ভগবান যিশুর মূর্তি স্থাপিত ছিল। তাঁর হাতে শরকাঠি, মাথায় কাঁটার মুকুট, গায়ে রক্ত ঝরছে। দুলতে দুলতে তাঞ্জাম সমেত মূর্তিটি সামনে দাঁড়ানো লোকগুলির ওপর দিয়ে এগোল।

তাঞ্জামটি সিঁড়ির নিচে এল আর এক ক্ষণিক বিরতির সময়ে অনুতাপীরা সকলে নিজেদের মধ্যে এক শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করছিল। আর তখনই দারাস্ত খানসামাকে দেখতে পেলেন। ভিড়ের মধ্যে পথ করে ও পোর্টিকোতে বার হল, নগ্ন ঊর্দ্ধাঙ্গ, দাড়ি ভরা মুখ, মাথায় শোলার পাতের উপর ন্যস্ত বিরাট এক আয়তাকার পাথর। ছোট দুটি পেশীবহুল হাতের ভাঁজে পাথরটির ভারসাম্য সুন্দরভাবে বজায় রেখে গির্জার সিঁড়ি বেয়ে সে দৃঢ় পায়ে নামছিল। সে তাঞ্জামটির পিছনে পৌঁছন মাত্র শোভাযাত্রা চলতে শুরু করল। তখন বারান্দা থেকে উজ্জ্বল রঙ্গের পোষাক পরা বাদকেরা বেরিয়ে পড়ল

BanglaBook.org

আর প্রাণপণে ফুঁ দিয়ে বাজাতে লাগল তাদের হাতের ফিতে ঝোলানো পিতলের বাদ্যযন্ত্রগুলিকে। দ্রুত কুচকাওয়াজের তালে অনুতাপীরা পা বাড়িয়ে, চত্বরে গিয়ে পৌঁছেছে এরকম একটা রাস্তা ধরে চলল। তাঞ্জামটি দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে শুধু রাঁধুনিকে আর তার পিছনের বাদকেরা দেখা যাচ্ছিল। এদের পিছন পিছন, চারিদিকের বাজির বিস্ফোরণের মাঝে, চলল জনসমুদ্র। এদিকে উড়োজাহাজটি ইঞ্জিনের প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে ফিরে এলো শোভাযাত্রার শেষ দলটির মাথার উপর। দারাস্ত শুধু খানসামার দিকে দেখছিলেন। সে এখন দূরে রাস্তায় ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওঁর মনে হল খানসামার কাঁধ যেন ঝুলে পড়েছে। কিন্তু এত দূর থেকে ওঁর ভাল ঠাহর হচ্ছিল না।

দু'পাশে বন্ধ দরজাগুলি ও দোকানপাটের মধ্য দিয়ে জনশূন্য পথে হেঁটে, বিচারপতি, পুলিশ অধিকর্তা ও দারাস্ত পৌরভবনে পৌঁছলেন। কোলাহল ও বিস্ফোরণের শব্দ দূরে যাওয়াতে শহর নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে আর এর মধ্যেই কিছু উড়ুবুস পাখি তাদের চিরকালের বাসস্থানে, বাড়ির ছাদগুলিতে, ফিরে এসেছে। নগরপালিকা দপ্তর এক দীর্ঘ সংকীর্ণ রাস্তার উপর, রাস্তাটি শহরের এক বহিরাঞ্চল থেকে এসে গির্জার সামনের চত্বর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখন সে রাস্তা জনশূন্য। ব্যালকনি থেকে যতটা দেখা যায় শুধুই খানাখন্দ ভরা পদপথ, সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে এখানে সেখানে জল জমে আছে। বেলা অনেকটা গড়িয়ে এসেছে কিন্তু তবুও রাস্তার ওপারের জানালাবিহীন দেওয়ালগুলিকে রোদ যেন কুরে কুরে খাচ্ছিল।

ওঁরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এতক্ষণ অপেক্ষা করলেন যে, সামনের বাড়ির দেওয়ালের রোদের দিকে তাকিয়ে দারাস্ত আবার খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন আর ওঁর মাথা ঘুরতে লাগল। খালি রাস্তা, জনশূন্য বাড়িগুলি একই সঙ্গে ওঁর মনে আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছিল। উনি এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইছিলেন, সেই বিশাল প্রস্তরখণ্ডটির কথা চিন্তা করছিলেন, আর চাইছিলেন এই পরীক্ষা যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়। খবর নেবার জন্য নিচে যাবার প্রস্তাব দিতে যাচ্ছিলেন, এই সময়েই গির্জার ঘণ্টাগুলি জোরে বাজতে শুরু করল। আর সেই সঙ্গে ওঁদের বাঁ দিকে, রাস্তার অন্য প্রান্ত থেকে এক বিরাট গোলমাল ফেটে পড়ল ও এক উত্তেজিত জনদল দেখা গেল। দূর থেকে সকলকে তাঞ্জামটির চারপাশে এক দঙ্গলে জড়ো হয়ে থাকতে দেখা গেল। পুণ্যার্থীরা এবং অনুতাপীরা বাজির শব্দ ও আনন্দধ্বনির সাথে ঐ সংকীর্ণ পথ দিয়ে এগোতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রাস্তাটা কানায় কানায় ভরে গেল আর দলটি পৌরভবনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এক অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলায়—নানা বয়সের, নানা বর্ণের, নানা পরিধানের মানুষদের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ—বিস্ফারিত চোখে ও প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে এগোচ্ছিল। বর্ষাফলকের মতো লম্বা সরু মোমবাতিবাহকের এক দল চলেছে এদের মাঝে। বাতিগুলির আলো এই প্রখর সূর্যের সামনে প্রায় অদৃশ্য। কিন্তু যখন এই দলটি পৌরভবনের বারান্দার নিচে এল—আর

BanglaBook.org

ভিড় এত প্রচণ্ড ছিল যে মনে হচ্ছিল ওরা বুঝিবা দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়বে—দারাস্ত দেখলেন জাহাজের খানসামাটি সেই দলে নেই।

বিদ্যুৎগতিতে এবং কারো কাছে সম্মতি না নিয়েই ব্যালকনি ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন দারাস্ত। লাফিয়ে সিঁড়িগুলি পার হয়ে—গির্জার ঘণ্টার ও বাজিগুলির কর্ণবিদারী শব্দের মধ্যে—রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে যুদ্ধ করতে হল ওঁকে—কলধ্বনিপূর্ণ জনতা, মোমবাতিবাহকের দল ও হতভম্ব অনুতাপীদের দলের ভিড়ের সঙ্গে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে অদম্য গতিতে এক পথ এই জনসমুদ্রের মধ্যে দিয়ে করে নিয়ে উনি যখন মুক্ত হয়ে জনতার পিছনে রাস্তার প্রান্তে পৌঁছলেন তখন ওঁর এমন অবস্থা যে উনি টলছিলেন ও প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। গনগনে গরম দেওয়ালে হেলান দিয়ে দম নেবার জন্য উনি দাঁড়ালেন। পরে আবার হাঁটা শুরু করলেন। ঠিক তখনই এক দল লোক রাস্তায় ঢুকে পড়ল। সামনের দিকের লোকগুলি পিছন ফিরে হাঁটছিল। আর দারাস্ত দেখতে পেলেন ওরা খানসামাকে ঘিরে আছে।

খানসামা দৃশ্যতই প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিল। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল, পরে একটু দৌড়চ্ছিল, প্রচণ্ড ভারে কুঁজো হয়ে জাহাজঘাটার খালাসির মতো বা কুলির মতো দ্রুতপদে, থপথপ করে ত্রস্ত ক্লান্ত পদক্ষেপে। যখন ও থেমে যাচ্ছিল ওর চারপাশে অনুতাপীরা—তাদের পরনে মোমের ফোঁটা জমে যাওয়া ধুলোভরা ময়লা প্রার্থনার পোষাক—ওকে উৎসাহ জোগাচ্ছিল। ওর বাঁ দিকে ওর ভাই, নীরবে, কখনো হাঁটছিল, কখনো দৌড়চ্ছিল। দারাস্ত-এর মনে হল, ওদের মাঝের দূরত্বটুকু পূরণ করতে ওরা অনন্তকাল সময় নিচ্ছিল। ওঁর কাছাকাছি এসে খানসামা আবার থামল আর এক শূন্যচোখে চারদিকে চেয়ে দেখল। যখন ও দারাস্ত-কে দেখল—মনে হল ও দারাস্তকে চিনতে পারেনি—দারাস্ত-এর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তৈলাক্ত ঘাম আর ময়লায় ঢাকা মুখ, কালি মেরে গেছে। দাড়িতে লালার সুতো জড়িয়ে আছে, ঠোঁট দুটি জুড়ে গেছে বাদামি ফেনায়। ও হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু গুরু ভারে চলৎশক্তিরহিত, ওর সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল। শুধু কাঁধের ওপর থেকে—স্বভাবতই এক অসাড়তায় আড়ষ্ট পেশীগুলি—নিশ্চল। ওর ভাই দারাস্ত-কে চিনতে পেরেছিল, শুধু বলল, 'এর মধ্যেই পড়ে গেছে একবার'। সোক্রাত হঠাৎই কোথা থেকে হাজির হয়ে ওঁর কানে কানে বলল, 'অনেক নাচানাচি—দারাস্ত সাহেব—সারারাত ধরে—ও থেকে গেছে।'

খানসামা আবার এগোল, অস্বচ্ছন্দ গতিতে। ও যেন এগিয়ে যেতে চাইছে না, যেন ওর কাঁধের বিরাট বোঝা থেকে পালাতে চাইছে, যেন ও ভাবছে হাঁটলে বোঝাটা হালকা হয়ে যাবে। দারাস্ত দেখলেন, কেমন করে উনি তা জানেন না, উনি খানসামার ডাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। দারাস্ত ওর পিঠে হালকা হাত রাখলেন আর ওর পাশে পাশে ভারী, দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটতে লাগলেন। রাস্তার অপর প্রান্তে তাঞ্জামটি অদৃশ্য হয়েছে, জনতা—এতক্ষণে নিশ্চয়ই চত্বরটিকে তারা ভরে ফেলেছে—মনে হচ্ছিল আর এগোচ্ছে না। কয়েক সেকেণ্ড পর্যন্ত দারাস্ত ও তার ভাই-এর মধ্যে খানসামা বেশ

BanglaBook.org

কিছুটা এগোল। কিছুক্ষণের মধ্যেই, পৌরভবনের সামনে তাকে দেখবার জন্য যাঁরা দাঁড়িয়েছিল তাদের বিশ মিটারের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল। কিন্তু খানসামা আবার থামল। দারাস্ত জোরে হাতের চাপ দিলেন—'চলো, শেফ' দারাস্ত বললেন 'আর একটু'। খানসামা কাঁপছিল, ঠোঁটের কশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছিল, আর সমস্ত শরীর থেকে ঘাম আক্ষরিকভাবেই ছিটকে বেরিয়ে আসছিল। ও একটা বড়ো দম নিতে গেল কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল। আবার চলতে শুরু করল, তিন পা এগোল, ইতস্তত করল। হঠাৎ পাথরটা পিছলে ওর কাঁধে পড়ে, কাঁধটা কেটে দিয়ে; সামনে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। খানসামা ভারসাম্য হারিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে গেল। যারা ওকে উৎসাহ যোগাবার জন্য সামনে ছিল, চিৎকার করে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল। ওদের মাঝে একজন শোলার পাতটা ধরে ফেলল, অন্যেরা পাথরটা হাতে ধরে তুলল খানসামার মাথায় আবার চাপিয়ে দেবার জন্য।

ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে দারাস্ত ওর কাঁধ থেকে ধুলো আর রক্ত হাত দিয়ে মুছে দিলেন। এদিকে খুদে মানুষটি তখন মাটিতে মুখ গুঁজে হাঁপাচ্ছে। ও কিছু শুনছেও না বা নড়াচড়া করছে না। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সময়ে ও এমন ব্যগ্রভাবে মুখ হাঁ করছে যেন ঐটেই ওর শেষ নিঃশ্বাস। কোমরে জড়িয়ে ধরে দারাস্ত ওকে তুলে ধরলেন এত অনায়াসে যেন একটা বাচ্ছা ছেলে। ধরে দাঁড় করিয়ে ওকে কাছে চেপে ধরলেন। সোজা দাঁড়িয়ে ওর দিকে ঝুঁকে ওর মুখের সামনে কিছু বললেন, যেন ওঁর নিজের শক্তি ভর দিচ্ছেন ওর মধ্যে। কিছু পরে নিজের রক্তাক্ত ও কাদামাখা শরীর ও দারাস্ত-এর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল, ওর চেহারায় এক ক্লান্ত অবসাদ জড়িয়ে আছে। টলতে টলতে ও আবার পাথরটার দিকে হাঁটা শুরু করল। ততক্ষণে অন্যেরা সেটাকে একটু তুলে ধরেছে। কিন্তু ও দাঁড়িয়ে গেল, এক শূন্য সৃষ্টিতে পাথরটার দিকে তাকাল আর মাথা নাড়ল। হাত দুটি শরীরের দু'পাশে ছেড়ে দিয়ে ও দারাস্ত-এর দিকে ফিরল। বড়ো বড়ো অশ্রুধারা নিঃশব্দে ওর বিধ্বস্ত মুখের ওপর গড়িয়ে পড়ছিল। সে কিছু বলতে চাইছিল—কিছু বলছিলও, কিন্তু ওর ঠোঁটগুলি শুধু নড়ছিল আর খুবই অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল 'আমি মানত করেছিলাম' আর পরে 'ক্যাপটেন ওক্যাপটেন'। অশ্রুতে ওর স্বর রুদ্ধ হল। ওর ভাই হঠাৎ পিছন থেকে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। খানসামা কাঁদতে কাঁদতে ওর বুকে নিজেকে এলিয়ে দিল, ওর মাথা পিছনে ঝুলে পড়েছে ও পরাজিত।

দারাস্ত ওকে দেখছিলেন, কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। দূরে জনতার দিকে তাকালেন। ওরা আবার চিৎকার শুরু করেছে। হঠাৎই শোলার পাতটি যার হাতে ছিল উনি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন আর পাথরটির দিকে এগোলেন। অন্যদের পাথরটা তুলতে ইশারা করলেন প্রায় বিনা আয়াসেই ভার নিয়ে নিলেন। পাথরের ভারে মাথা একটু নুয়ে পড়েছে, কাঁধের পেশীগুলি দৃঢ়বদ্ধ, অল্প হাঁপাতে হাঁপাতে উনি নিজের পায়ের দিকে তাকালেন আর খানসামার গোঙানি শুনতে লাগলেন। পরে উনি ওঁর নিজের মতো রওয়ানা হলেন, জোর পায়ে, রাস্তার প্রান্তে জনতা পর্যন্ত একটুও

BanglaBook.org

দুর্বলতা না দেখিয়ে উনি গিয়ে এগিয়ে গেলেন আর প্রথম সারির লোকগুলির মধ্য দিয়ে জোর করে পথ করে নিয়ে। ওঁর সামনে ওরা পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছিল। দুই দিকে ঘন জনতা যারা অবাক হয়ে ওঁকে দেখছিল আর এখন হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়েছিল, তাদের ভিতর দিয়ে, গির্জার ঘণ্টাধ্বনি ও বাজির শব্দের মাঝে, উনি চত্বরে পৌঁছলেন। একই রকম শক্ত পায়ে উনি এগিয়ে যেতে থাকলেন আর দুই ধারে জনতা সরে গিয়ে গির্জা পর্যন্ত যাবার জন্য ওঁকে পথ করে দিচ্ছিল। যদিও এই ওজন ওঁর ঘাড় ও মাথাকে পিষে ফেলছিল, তবুও গির্জা ও তাঞ্জামটিকে গির্জার দরজায় উনি দেখতে পেলেন যেন ওঁর জন্যই অপেক্ষা করছে। উনি সেই দিকে হাঁটা শুরু করলেন এবং যখন চত্বরের অর্ধেক পার হয়ে গেছেন তখন হঠাৎই, কেন উনি তা জানেন না, বাঁ দিকে ঘুরে গেলেন উনি—পুণ্যার্থীদের মুখোমুখি—আর গির্জা থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। শুনতে পেলেন দ্রুত পায়ে ওঁর পিছনে কেউ আসছে। ওঁর সামনে চারিদিকে সকলেরই মুখ হাঁ। উনি বুঝতে পারছিলেন না ওরা কি বলে চেঁচাচ্ছে, যদিও যে পর্তুগীজ শব্দটি ওরা লাগাতার বলে চলেছিল সেটা ওঁর কাছে চেনা লাগছিল। হঠাৎ সোক্রাত এসে ওঁর সামনে হাজির হল। ওর বিস্ফারিত চোখগুলি ঘুরিয়ে অসংলগ্নভাবে একনাগাড়ে কিছু বলতে লাগল ও আঙুল দিয়ে পিছনের গির্জাটা দেখাতে লাগল। 'গির্জাতে! গির্জাতে!' সোক্রাত ও জনতা এই চিৎকারই করছিল। দারাস্ত তবুও নিজের পথে চলতে লাগলেন। সোক্রাত রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল হাত দুটি আকাশের দিকে হতাশ ভাবে তুলে ধরে। জনতাও ধীরে চুপ করে গেল। যখন দারাস্ত প্রথম রাস্তাটায় পড়লেন—ঐ রাস্তায় উনি আগেও খানসামার সঙ্গে গিয়েছেন, এবং জানতেন ওটা নদীর পাশের কুটিরগুলির দিকে গেছে—তখন ওঁর পেছনে শুধু কিছু অবোধ্য গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল।

পাথরটির ওজনে এখন ওঁর মাথায় ব্যথা করছিল, এবং তাকে একটু হাল্কা করবার জন্য ওঁর দীর্ঘ দুই বাহুর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছিল। পিছল ঢালের প্রথম রাস্তাগুলিতে যখন উনি পড়লেন এর মধ্যেই ওঁর কাঁধ দড়ি পাকিয়ে উঠেছিল। উনি দাঁড়িয়ে পড়ে শোনবার জন্য কান পাতলেন। উনি একাই ছিলেন। শোলার পাতের উপর পাথরটা সঠিকভাবে রেখে উনি সাবধানে, দৃঢ় পায়ে কুটিরগুলির দিকে এগোলেন। যখন উনি কুটিরগুলর কাছাকাছি পৌঁছলেন ওঁর দম ফুরিয়ে গিয়েছিল, পাথরের ভারে বাহুগুলি কাঁপছিল। দ্রুত পায়ে উনি সেই ছোট অঙ্গনটিতে পৌঁছলেন যেখানে খানসামার কুটিরটি ছিল। দৌড়ে কুটিরটির সামনে গেলেন, পায়ের এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেললেন আর একই সঙ্গে পাথরটাকে ছুঁড়ে ঘরের কেন্দ্রে ফেললেন—যেখানে তখনও আগুন জ্বলছিল। সেখানে, সমস্ত শরীর সোজা করে দাঁড়িয়ে, সহসা বিরাট হয়ে গেলেন তিনি, তাঁর পরিচিত দারিদ্র ও ভস্মের গন্ধকে বড়ে বড়ো নিরাশ ঢোঁকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানতে থাকলেন তিনি। এক অজানা শ্বাসরোধী আনন্দের জোয়ার ওঁর মধ্যে বয়ে গেল। একে ব্যাখ্যা করা ওঁর শক্তির বাইরে।

BanglaBook.org

কুটিরের বাসিন্দারা এসে দারাস্ত-কে দেখতে পেল, পিছনের দেওয়ালে কাঁধে ভর দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের ঠিক মধ্যিখানে, অগ্নিকুণ্ডে, অর্ধপ্রোথিত হয়ে ছিল পাথরটি, ভস্মে আর মাটিতে আবৃত। সকলেই, আর না এগিয়ে, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, ও নীরবে দারাস্ত-কে দেখতে লাগল যেন প্রশ্ন করছে তাঁকে। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তখন ভাইটি খানসামাকে পাথরের কাছে নিয়ে এল, খানসামা ওখানে মাটিতে পড়ে গেল। ভাই নিজেও বসে পড়ল ও অন্য সকলকে ইশারা করল। বৃদ্ধা রমণী ওদের সঙ্গে যোগ দিল আর পরে সেই রাতের তরুণী মেয়েটিও এল কিন্তু কেউই দারাস্ত-এর দিকে দেখছিল না। পাথরটিকে ঘিরে গোল হয়ে সকলে নীরবে বসে রইল। এই ভারী বাতাসে শুধু নদীর কলধ্বনি ওদের কানে আসছিল। দারাস্ত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, এক শূন্য দৃষ্টিতে সব কিছু শুনছিলেন আর এই জলের শব্দ ওঁর মধ্যে এক সুখের জোয়ার আনছিল। চোখ বন্ধ রেখে, আনন্দে আপন শক্তির বন্দনা করলেন তিনি, যে নবজীবন শুরু হচ্ছে আরও একবার তার বন্দনা করলেন তিনি। এই সময়েই খুব নিকটেই একটা পটকা ফাটল। ভাইটি খানসামার পাশ থেকে একটু সরে এল ও দারাস্ত-এর দিকে আধা পিঠ ফিরিয়ে, তাঁর দিকে না তাকিয়েই বলল 'আমাদের সাথে বোসো'।

ফরাসী থেকে ভাষান্তর : পবিত্র সেনগুপ্ত

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG